সমরেশ মজুমদার

এই আমি রেণু

এই আমি রেণু

সমরেশ মজুমদার

শিলালিপি
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৫৮

প্রচ্ছদ : সুদিপ্ত বসু

‘শিলালিপি’র পক্ষে শ্রীঅরুণ ঘোষ কর্তৃক ৫১, সীতরাম ঘোষ স্ট্রী
কলকাতা নয় থেকে প্রকাশিত, শ্রীরামপ্রসাদ নাগ, সারদা প্রটা
কলকাতা-বার থেকে মুদ্রিত এবং কৌশিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, কলকাতা-বা
থেকে গ্রথিত।

অসীম চক্রবর্তী
দুলেন্দ্র ভৌমিক
আমার দুই বন্ধুকে

পকেট থেকে চাবি বের করতে গিয়ে সুমিত থমকে দাঁড়ালো। দরজা ভেজানো, তালা খোলা। অথচ ওর স্পষ্ট মনে আছে বেরুবার সময় ও ঠিকঠাক তালা লাগিয়েছিল। ওদের এই মেসের বাসিন্দারা একটু অন্য ধরনের, কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলায় না, প্রত্যেকেই ভাল চাকরী করে, চুরিটুরি কোনকালেই হয়নি। কেউ যে ইয়ার্কি করে তালা খুলবে এমন নয়।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে চমকে উঠলো সুমিত। সারাঘর তছনছ করে গেছে কেউ, জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো। এমনকি ওর স্যুটকেশের ডালা খোলা, জামা-প্যান্ট বিছানার ওপর স্তূপ করে রাখা। টেবিলে দামী ঘড়িটা ঠিক আছে, একটা সেফার্স কলম ছিল সেটাও আছে। মাথার বালিশের নিচে একটা মোটা খামে তিনশো টাকা ছিল, সুমিত দেখলো যে এসেছিলো সে টাকাগুলো স্পর্শ করেনি।

বাইরে বেরিয়ে এসে সুমিত চেঁচিয়ে ওদের চাকরকে ডাকলো। লোকটা অনেক দিনের পুরোন, হলফ করে বললো কাউকে আসতে দ্যাখেনি। আজ রবিবার, সব বাবুরা মেসেই আছেন, কেউ এলে নিশ্চয়ই জানা যেত। সুমিতের ঘর তিনতলায় ছাদের ওপর। সিঁড়ি দিয়ে অচেনা লোক এলে ঠাকুর-চাকর কেউ না কেউ দেখত।

অথচ বোঝাই যাচ্ছে কেউ ওর ঘরে এসেছিল। বাইরে থেকে যদি না আসে, তাহলে এই মেসেরই কেউ। সেটা ভাবতে সুমিতের কষ্ট হচ্ছে। জিনিসপত্রগুলো গোছাতে গিয়ে ও দেখলো কিছুই নিয়ে যায়নি লোকটা। তাহলে কেন এসেছিলো? সুমিত কেমন নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিলো।

ওর জানালা দিয়ে সামনের ট্রাম রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, রাস্তায় লোকজন এদিকটায় কম। সুমিত দেখলো একটা খারাপ ট্রাম আলো নিভিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল। আর ঠিক ট্রামটা চলে যেতেই ও দেখতে পেলো সামনের সিগারেটের দোকানের পাশে ঝোলান দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে একটা গুড্ডা মতন লোক ওর ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে জানলার সামনে থেকে সরে এলো সুমিত, তারপর যাতে ওকে না দেখতে পায় এমনভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো। লোকটাকে আগে কখনও দ্যাখেনি সে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এদিকে। এক সময় সিগারেটওয়ালাকে কি জিজ্ঞাসা করলো। কি করলো, 'সেটা অবশ্য ইচ্ছে করলেই জানতে পারে সুমিত। রোজ তিন প্যাকেট ফিল্টার উইলস কেনে ও লোকটার কাছ থেকে, মহাবীর না কি যেন নাম। সিগারেট ধরিয়ে লোকটা পাশের রকে গিয়ে উঁচু হয়ে বসলো। অনেকটা শকুনের মতন, টাক মাথাটা ওপর দিকে তোলা।

এই লোকটাই কি ওর ঘরে এসেছিলো? সুমিত ওর ঘরে পায়চারি করলো খানিক। হঠাৎ ওর মনে পড়লো কাল অফিসে একটা টেলিফোন এসেছিল। ও তখন ডিরেক্টরের ঘরে। ফিরে এসে শুনলো যে টেলিফোন করেছিলো সে নাম বলেনি। মেয়েলি গলা। শুনে একটু অবাক হয়েছিলো ও। মহিলাদের সঙ্গে ইদানিং ওর যোগাযোগ নেই। আগে য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সবার মতন ওরও কিছু মেয়ে বন্ধু ছিলো। তারা, যেমন হয়, আর যোগাযোগ রাখেনি। ঠিক তখন ওর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিলো। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে সিগারেট ধরিয়েছিলো সুমিত। যাঃ, হতেই পারে না। যে টেলিফোন ধরেছিলো তাকে গলাটা কেমন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো ওর। বুকের মধ্যে কিছু একটা তির তির করে কাঁপুনি ধরাচ্ছিলো।

লোকটা এখনও বসে আছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

একে একে। রাস্তায় লোকজন কম। কেউ একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে—এটা কতক্ষণ সহ্য করা যায়। তাছাড়া লোকটা বেশ রোগা পটকা, ইচ্ছে করলেই সুমিত ওকে কাবু করতে পারে। দরজা বন্ধ করে ও নিচে নেমে এলো।

আকাশে একটু মেঘ জমেছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সুমিত ট্রাম লাইন পেরিয়ে সিগারেটের দোকানের কাছে এলো। লোকটা তখনও ওর ঘরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ইচ্ছে করেই ঘরের আলো নেবায়নি সুমিত। প্রায় পাশে এসে ভাল করে লোকটাকে দেখলো ও। এক একটা লোক থাকে যাকে দেখলেই গিরগিটির কথা মনে পড়ে, প্যাণ্ট বা ধুতি কোনটাতেই তাদের মানায় না। এই সময় লোকটার নজর পড়লো ওর দিকে। চমকে উঠে মাথা ঝাঁকালো লোকটা। বাঁ-হাতের তর্জনী তুলে ওকে ডাকলো সুমিত। একটা শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো লোকটা। না, কোন কালে একে দেখেনি সুমিত। এরকম চেহারা কোনকালে ভোলা যায় না।

'কি চাই ?'

হাসলো লোকটা। গা রি-রি করে উঠল সুমিতের। হাসির সময় কালো মাড়ি দেখা একদম সহ্য হয় না ওর।

'আসুন স্যার, একটু চা—।' ঘাড় বেঁকিয়ে সুমিতের দিকে একটু হেসে আঙুল দিয়ে ওপাশের চায়ের দোকান দেখালো। লোকটা এর মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে, সুমিত অবাক হয়ে দেখলো।

'আমার ঘরে আপনি গিয়েছিলেন ?' সুমিতের ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটার জামার কলার আঁকড়ে ধরে। সুপুরি গাছের মত মাথা দোলালো লোকটা, 'নেভার, নেভার। আমি স্যার বেলা তিনটে থেকে এখানে বসে আছি, বিশ্বাস না হয় ওই সিগারেটের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করুন। ও-সবের মধ্যে আমি নেই। কি যে বলেন স্যার!' তারপর হঠাৎ চুপ করে ওর ঘরের দিকে আঙুল

দেখিয়ে বললো, 'আলোটা জ্বেলে এসে আমাকে ভড়কে দিয়েছিলেন মাইরি। আসুন স্যার একটু চা খাই, পাঁচ ঘণ্টা চা খাইনি, খেতে খেতে কথা বলি।' সুড়ুৎ করে রাস্তা পেরিয়ে গেল লোকটা, গিয়ে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরে তাকালো।

দারুণ অবাক হলো সুমিত। লোকটা একটুও অপেক্ষা করল না চা খেতে ওর আগ্রহ আছে কিনা জানার জন্য। চায়ের দোকানটা এখন খালি হয়ে এসেছে। চা খেতে ওর কোন সময়ই আপত্তি নেই, কিন্তু এই লোকটার সঙ্গে খাবে কেন? প্রথম কথা লোকটাকে সে চেনে না, তার ওপর এর চাল-চলন সন্দেহজনক। বিনা কারণে ও চা খেতে বলবেই বা কেন? ও যদি তিনটে থেকে এখানে বসে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছে কেউ ওর ঘরে এসেছিল! সুমিত সিগারেটওয়ালার সামনে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে লোকটাকে দেখালো, 'এই লোকটা এখানে কতক্ষণ আছে তুমি জানো?' মুখ বাড়িয়ে মহাবীর না কি যেন নাম, লোকটাকে দেখলো, 'হাঁ সাব, সামকো আগেসে ইঁহা বৈঠা হ্যায়, সি আই ডি হোগা সাইদ, কাঁহাভি নেহি গিয়া আউর আপকো বাত পুছা।' সুমিত দেখলো লোকটা মাথা নেড়ে তাকে ডাকছে।

শেষ পর্যন্ত একটা কৌতুহল ওকে চায়ের দোকানে নিয়ে এলো। কোণার দিকের একটা টেবিলে বসেছিলো লোকটা। পাসিং-শোর একটা প্যাকেট দিয়ে টেবিল ঠুকছিল। কৌতুক বোধ করলো সুমিত। আজকাল পাসিং-শোর প্যাকেট হাতে বড় একটা কাউকে দেখা যায় না। সুমিতকে দেখেই লোকটা বললো, 'বিশ্বাস হ'ল স্যার?' তারপর চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লো, 'এই লাইনে পঁচিশ বছর কাজ করেছি মিথ্যা জিনিসটা আমার মধ্যে পাবেন না একদম।'

সুমিত চেয়ার টেনে বসতেই লোকটা বললো, 'দেশলাই আছে স্যার?' যেন তার কাছে দেশলাই আছে কি না জানবার জন্যই তাকে ডাকা। পকেটে থাকা সত্ত্বেও সুমিত বললো, 'না।' লোকটা

চার

বয়কে ডাকলো, দেশলাই চেয়ে নিয়ে দু কাপ চা দিতে বললো। সুমিত বললো, 'এক কাপ দিতে বলুন।'

চোখ ছোট ছোট করে তাকালো লোকটা, মানে? আপনি খাবেন না? সেকি! আপনার তো চায়ে অরুচি নেই। কাল সারাদিনে সাতকাপ চা খেয়েছেন। মেসে দু'কাপ বাইরে পাঁচ কাপ। তার মধ্যে অফিসে তিন কাপ, আর দুই কাপ চৌরঙ্গীতে আপনাদের আড্ডায়। যাঃ, চা খাবেন না তা কি হয়!' মাড়ি বের করে হাসলো লোকটা।

হতভম্ভ হয়ে গেল সুমিত। সত্যিই তো কাল বেশি চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আর এটা তো তার খেয়াল হয়নি। এই লোকটা এ-সব জানল কি করে? তার মানে নিশ্চয়ই ও পেছন পেছন ঘুরেছে কালকে। অথচ একে একবারও দ্যাখেনি সুমিত।

'কি বলতে চান বলুন।' গম্ভীর হ'ল সুমিত।

হাসলো লোকটা, 'বসুন না, চা আসুক।'

'আপনাকে আমি কিন্তু চিনি না।' কথা বলতে চাইলো সুমিত। লোকটা যেন তার ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইছে। ব্যাপারটা হতে দেওয়া ঠিক নয়।

'না না চিনবেন কি করে!'

'তাহলে!'

'স্যার, আপনার সঙ্গে একটা ব্যবসার কথা বলতে এসেছি।'

'ব্যবসা', মজা লাগলো সুমিতের, 'আমি ব্যবসা করি না।'

'আমি করি স্যার।'

'কিসের?

'হবে হবে, চা খান আগে।' সিগারেট ধরিয়ে মুঠো করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো লোকটা। এখন ওর চোখ বন্ধ। যেন সময় নিয়ে পরিবেশ তৈরী করতে চায়। জামা-কাপড়ে লোকটার অবস্থা তেমন ভাল নয়। হলদে টেরিলিনের সার্টের ফাইবার উঠি উঠি করছে। এই ধরনের সার্ট আজকাল কেউ পরে না। নাকের

লোমগুলো আরশুলার ঠ্যাঙের মত বেরিয়ে এসেছে। লোকটার সারা শরীরে সৌখিনতার মধ্যে বাঁ হাতের কনুইয়ের উপর লাল সুতোয় বাঁধা পেতলের একটি তাবিচ তার ওপর ইংরেজীতে নাম খোদাই করা বি জি।

'কি বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।' সুমিত পা ঘষলো।

'আপনার ঘরে স্যার চারটে নাগাদ লোক ঢুকেছিলো।' বয় চা দিয়ে যেতেই খুব সহজ গলায় লোকটা বললো। 'আমি প্রথম ভেবেছিলাম ছিচকে চোর পরে বুঝলাম, না।'

সোজা হয়ে বসলো সুমিত, 'আপনি দেখেছেন ?'

ঘাড় নাড়লো লোকটা, 'আপনাদের পাশের বাড়িটা তো একটা স্কুল না। ওর ছাদ থেকে আপনাদের ছাদে চলে এলো লোকটা। তারপর একটা জানালায় মুখ দেখলাম। মুখ দেখেই বোঝা যায় নিরাশ হয়েছে। তারপর নিচে একটা জিপের দিকে হাত নেড়ে কি বলে চলে এলো স্কুল বাড়ি দিয়ে। জিপটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো, আমি লক্ষ্য করিনি। লোকটা জিপে উঠে বলেছিলো, একটাও পেলাম না, আসলটাও নেই। কথাটা আমি শুনেছি স্যার।' হঠাৎ লোকটা ওর হাত চেপে ধরলো, 'স্যার, তিনদিন ধরে আপনি আমাকে খুব ঘুরিয়েছেন, একটু যে একা পাব তার উপায় নেই। মেসে বা অফিসে যেতে সাহস হয় না। এদিকে আমার ক্লায়েন্ট মাইরি—মালটা আমাকে দিয়ে দিন স্যার, প্লিজ।'

'মাল ? কি যা তা বলছেন ?' রেগে গেল সুমিত।

মুখ নিচু করে চায়ের তলানিটা খেলো লোকটা, তারপর হেসে বললো, 'চিঠিগুলোর কথা বলছি স্যার।'

'চিঠি—কিসের চিঠি ?' বিরক্ত এবং অবাক হয়ে সুমিত চোখ কোঁচকালো। লোকটা তাকে কি বলতে চায়। বলছে কদিন থেকেই ফলো করছে। শালা! এই কদিনে সে অনেক কিছুই করেছে যা এই লোকটা দেখেছে। অনেক কিছু, যা নিজে নিজে করা যায় এবং যা নিজের কাছে সাধারণ ব্যাপার তা অন্য কেউ

জানলে বা দেখলে বিচ্ছিরি হয়ে যায়। ভরা বাসে দাঁড়িয়ে মেয়েদের ভাল বুক আড়চোখে দেখতে বেশ লাগে কিন্তু যখনই বুঝতে পারা যায়, আর কেউ ব্যাপারটা দেখছে ঠিক তখন সব তেতো হয়ে যায়। এই লোকটা ওর নিজস্ব ব্যাপার—। ঠোঁট কামড়ালো সুমিত। এ শালা চিঠি চাইছে। কার চিঠি ?

'স্যার, আমার ক্লায়েন্ট খরচ করতে রাজী আছে, আপনি চিঠিগুলো দিয়ে দিন।' দেশলাই চাওয়ার মত মুখ করে লোকটা বললো। 'পরিষ্কার করে বলুন, আমি বুঝতে পারছি না। সুমিত ওর চোখের দিকে তাকালো। শালার চোখ কখনও এক জায়গায় থেমে থাকে না।

চেয়ারটা টেনে নিলো লোকটা, 'আর কাবো চিঠি আছে নাকি আপনার কাছে ? দিয়ে দিন স্যাব, ফিফটি ফিফটি হয়ে যাবে।'

'কি পাগলের মত বলছেন ?' ধমকে উঠলো সুমিত। ওর গলার স্বর শুনেই লোকটা চট করে হাতের তাবিচটা আঁকড়ে ধরলো, ধরে হাসলো, 'রাগ করবেন না স্যার। এইটাই আমার ব্যবসা। আগে লোকে একটাই প্রেম করত, আমরাও দুটো পয়সা পেতাম। ব্যাপারটা যে অনেকদিন গড়াতো। আব এখন নাকি একটাই প্রেম ভেঙে ভেঙে একে দেয় তাকে দেয়। শালা গা ধোওয়া জলের মতন, কেউ কেয়ারই করে না। যাক্, এই কেসটা খুব ভাল পেয়ে গেছি স্যার। তবে আপনার হেল্প চাই। আপনি রেণুদেবীর চিঠিগুলো আমাকে দিয়ে দিন। পার্টি আপনাকে ক্যাশ দেবে। বলুন কত চাই স্যার !'

রেণু ! বিস্ময়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে সুমিতের দম বন্ধ হয়ে গেল। এই দুটো অক্ষর যখন এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তখন কেন সমস্ত শরীর এমন অসাড় হয়ে যায় ! পৃথিবীতে তো এই নামের কত মেয়ে আছে, তবু শব্দটা এমন করে বুকের মধ্যে ছটফটানি ছড়িয়ে দেয় কেন ? কি সহজে একটা পদ্মপাতা মুখ চোখের সামনেটা ভরাট ক'রে দেয় !

লোকটার দিকে তাকাল সুমিত। এর মুখে নামটা এত বিশ্রী শোনাচ্ছে! 'আপনি রেণুকে চেনেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল লোকটা, 'না, না, ছি, ছি। আমাকে ওঁর স্বামী এনগেজড করেছেন। তবে একদিন দেখেছিলাম একটু. সত্যিই আমাদের স্ত্রীরা দেখতে কি বিচ্ছিরি।'

'রেণুব স্বামী আপনাকে পাঠিয়েছে?' বিস্ময়ে ভাল করে কথা বলতে পারছিল না সুমিত। রেণু, রেণুব স্বামী। রেণুর স্বামীকে কোনদিন দ্যাখেনি ও।

'হ্যাঁ স্যার। উনি ভদ্রভাবে কাজটা সারতে চান। আমাকে বলেছেন চিঠিগুলি নিয়ে যেতে, যা দাম লাগবে দিয়ে দেবেন। খুব ঝামেলা চলছে বোধহয়, বুঝলেন না!'

উঠে দাঁড়াল সুমিত। লোকটা হাঁ করে ওকে দেখছিল। কোন কথা না বলে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল সুমিত। চট করে তাড়াতাড়ি বয়ের দিকে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ওর পেছন পেছন ছুটে এল লোকটা, স্যার, আপনার কাছে একটা চিঠি আছে রেণুদেবীর। সেই যে যেটায় উনি—কনফেশন—মানে আপনার আগে যাদের যাদের সঙ্গে—কিছু মনে করবেন না স্যার—ঐ চিঠিটাই দরকার। পার্টি এক হাজার দেবে।'

'এসব—এসব কি করে জানা গেল!' ঘোরের মধ্যে বলল সুমিত।

'সে স্যার দারুণ ব্যাপার! রেণুদেবী নাকি বাথরুমে বসে খবরটা লিখেছিলেন ভাইকে। সেটা পোস্ট করে বাড়ির ঝি। মুখার্জী সাহেব মানে রেণুদেবীর স্বামী সেটা ধরে ফেলেন। আর তাতেই আপনার নাম ধাম—বুঝলেন স্যার। তা আমি বলি কি মুখার্জী সাহেবের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি, চিঠিটা আপনি দিয়েই দিন।'

'আমি রেণু বলে কাউকে চিনি না।' সোজা হাঁটতে লাগলো সুমিত। বাঁ হাতের তাবিচটা আঁকড়ে ধরে পেছন পেছন এলো লোকটা, 'কি যে ইয়ার্কি করেন স্যার, আপনি মাইরি—'

চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার জামার কলার মুঠো করে ধরে প্রায় ওপরে টেনে তুললো সুমিত, 'মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব বদমাস, ভাগ।' ছেড়ে দিতেই ধপাস করে বসে পড়লো লোকটা মাটিতে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, স্যার। আপনি আজ একটু উত্তেজিত, আমি আবার আসব, আপনি ভাবুন ভাল করে। মুশকিল হ'ল আর একটা পার্টি আজ আপনার ঘরে এসেছিল—কম্পিটিটার কিনা কে জানে!'

পথ চলতে চলতে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়ছে আশে-পাশে। সুমিত আর তাকালো না, সোজা মেসের রাস্তা ধরলো। এখন রাত হয়েছে বোঝা যায়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ওর আবার মনে পড়লো চোরের কথা। লোকটা বলছে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। তাহলে কি ওরা এই লোকটার মতন একই ধান্দায় এসেছিলো? এরা কারা তাহলে! বাইরে হাওয়া বেশ জোরে বইছে, এতক্ষণ রেস্টুরেন্টে বোঝা যাচ্ছিলো না। জোরে জোরে পা ফেলে মেসে ফিরে এল সুমিত।

আলো জ্বলছিলো ঘরে। সুমিত দরজা ভেজিয়ে একটু চুপ করে দাঁড়ালো। এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে এসেছিলো সে কি জন্য এসেছিলো। দ্রুতপায়ে ও খাটের কাছে চলে এল। খাটের সামনে দেওয়ালে যেদিকে মুখ করে ও শোয়, সেখানে একটা ছবি টাঙানো। বড় ফ্রেমের মধ্যে বসে সুমিত হাসছে। হাফ বাস্ট ছবি, কমলা রঙের পুলওভার পরা। তখন ওর মাথার চুল বেশ ফাঁপানো ছিল, চিবুকের কাছটা মিষ্টি মিষ্টি দেখাত। হাত বাড়িয়ে ছবিটাকে দেওয়াল থেকে খুলে আনলো ও। বুকের মধ্যে যে ভয়টা রবারের বলের মত ড্রপ খাচ্ছিলো, কাঁচের ফ্রেমের গায়ে লাগা ধুলো দেখে তা গড়িয়ে গড়িয়ে গেলো। না, এখানে কারো হাত পড়েনি। ছবিটার পেছন দিকে পেরেকের বেড়ার মধ্যে অনেককাল পড়ে থাকা মোটা খামটাকে বের করলো সুমিত। অনেক, অনেকদিন হাত দেয়নি ও। হঠাৎ হাসি পেয়ে গেলো এখন, নিছক খেয়ালের বসে

একদিন ও নিজের ছবির পেছনে ছোট পেরেকের গায়ে খামটাকে বিদ্ধ করে রেখেছিলো। কেন কে জানে, হয়তো কোন কারণ ছিলো না, কিংবা মনে মনে অন্য কিছু কাজ করছিলো। এখন মনে হ'ল, সে যাই হোক যে এসেছিলো তার সুমিতের ছবির দিকে তাকানোর ভাগ্যিস প্রয়োজন ছিলো না।

খামটা খুললো সুমিত, আর খুলতেই এক রাশ শিউলি ফুলের মতন একটা মুখ হেসে উঠলো, যার নীচে ছোট ছোট গোটা অক্ষরে লেখা, 'এই আমি রেণু।'

আমি রেণু। এই যথেষ্ট, আর কিছু জানবাব দরকার নেই। আমি রেণু, এতেই আমি সম্পূর্ণ। এই আমি তোমার সামনে হাসছি, আর কি হবে জেনে। গ্লসি পেপারে ছাপা ছবিটায় রেণু ঘাড় কাৎ করে হাসছে। মাথার দু'পাশে খোলা চুলের কালোয় ফরসা মুখখানা যেন আরো টাটকা লাগছে। দুটো বড় বড় চোখে (রেণু, তুমি কি কাজল পরতে ?) খুশীর সুন্দর কারুকাজ, কপালটা একটু চওড়া তাই খুব বড় করে টিপ পরা বলে চোখে আরাম লাগে। ছবিতে রেণু হাসছে, হাসলে অল্প গজদাঁত দেখা যায়। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বুকের ভিতর পাক খেয়ে যাওয়া বাতাস কেঁপে কেঁপে নিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যায়। ছবিটা দেখতে দেখতে সুমিত স্পষ্ট শুনতে পেলো, 'এই, আমি রেণু।'

ছবিটার সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে যে দশপাতার চিঠি তার জন্যেই কি ওরা এসেছিল ? রেণুর স্বামীর এটা দরকার ! রেণুর বিরুদ্ধে বোধহয় এটাকে কাজে লাগাবেন। হেসে ফেললো সুমিত, কি করেছ রেণু, এমন বোকামি কেউ করে ! আসলে রেণু তুমি একটা আস্ত মেয়ে, ছবিটার দিকে তাকাল সুমিত, মেয়েদের মতন চট করে বোকামি করতে কোন ছেলে পারে না। চিঠিটা খুললো ও। এর প্রত্যেকটা শব্দ ওর মুখস্থ। এত সুন্দর করে লেখা চিঠি ও কখনো পড়েনি। না, কোন সম্বোধন নেই, বছর দেড়েক আগের একটা বসন্তকালের তারিখ চিঠির মাথায়। শুরুতেই কি একটা লিখে কেটে

দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে কালি দেওয়া বোঝা যায় না কিছুতেই। তারপর, 'আমার বিয়ের খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে এতক্ষণে, দিনটা এসে গেল বলে।' আর চিঠির শেষে 'ভালো থেকে কিন্তু। আমি রেণু।' আর এর মধ্যে যে লাইনের পর লাইন, যেগুলো এক সন্ধ্যায় সুমিতের বুকে ছোট ছোট চিতা সাজিয়ে দিয়েছিলো, যেগুলো সত্যি নয় প্রমাণ করার জন্য ও পাগলের মত কয়েকজনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—এখন বুকের মধ্যে সেগুলো চৈত্র দিনের দুপুরের হাওয়ার মত তাপ ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

হলদে শাড়ি পরত রেণু। মাথার চুলের প্রান্তে ছোট্ট একটা বাঁধুনি, চুলগুলো ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে থাকতো চওড়া পিঠে। মেয়েদের পিঠ ভরাট হলে এত সুন্দর দেখায় রেণুকে না দেখলে বোঝা যাবে না। খুব লম্বা নয় রেণু কিন্তু গলার গড়নে ওকে লম্বা দেখাতো বেশ। বছর আড়াই আগে ওরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ক্লাশের ছাত্র।

খুব পরিষ্কার সেই বিকেলটা। সবে সুধাংশুবাবুর ক্লাস শেষ হয়েছে। এই একটা ক্লাশ করার জন্য ওরা কফিহাউস থেকে ফিরে আসতো। শেষ হতেই সুমিত বেরিয়েছে এমন সময় রেণু ওর সামনে এলো। বাঁ হাতে কপালের চুল সরিয়ে ওর চোখে চোখ রেখে বললো, 'আচ্ছা, আপনি এত কি দেখেন বলুন তো!'

কথাটা শুনে কেমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলো সুমিত। এভাবে ও এসে কথা বলবে—এতটা ভাবেনি কোনদিন। যখনি ক্লাসে এসেছে ও পেছন দিকে বসেছে। আর সেইখান থেকে সামনে বসা ছেলেমেয়ের মাথার পাশ দিয়ে একটা সরল রেখা হয়ে যেত একসময়, যার অপরপ্রান্তে থাকতো রেণুর মুখ। অনেকদিন ওর নাম জানেনি সে। মফস্বলের ছেলে ও, নিজে এগিয়ে গিয়ে কোলকাতার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার মত মানসিক গঠন হয়নি তখনো। মেয়েদের যে একটা নিজস্ব ইন্দ্রিয় আছে যাতে নিজের বুঝতে পারে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা, রেণু বুঝে ফেলে দেখতে

ভেবে।

প্রথম দিনই। নইলে দুবার তাকিয়ে মাথা ঘুরিয়ে নিল কেন? তারপর একসময় এটা একটা মজার খেলা হয়ে গেল সুমিতের কাছে। আর এই খেলার নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল এমনই যে পরপর কয়েকদিন ও না আসাতে মন মেজাজ বিচ্ছিরি হয়ে গেল সুমিতের। ওর নাম জেনেছিল সে, অশোক ওর বন্ধু, এসে বলেছিল, 'দারুন ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে—যা না বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নে। আসছে না কেন ছাখ।'

'যাঃ, আমার সঙ্গে আলাপই নেই।' হেসেছিল সুমিত।

'তুই একটা গুড ফর নাথিং। একবছর ধরে একটা মেয়েকে শুধু দেখেই গেলি, গিয়ে আলাপ করতে পারলি না পর্যন্ত।' অশোক ঠাট্টা করেছিলো।

সেই মেয়েই কদিন বাদেই ফিরে ক্লাশ শেষে ওর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা, আপনি এত কি ছাখেন বলুন তো?'

এক মুহূর্তেই লক্ষ বার মনে মনে বলে ফেললো সুমিত, তোমাকে। মুখে কিছু বললো না, মাথা নিচু করে হাসলো।

কি কিছু বলছেন না কেন? রেণুর গলা যেন ওকে ছোট ছোট টোকা দিয়ে গেলো। রেণুর মুখের দিকে তাকাল ও, 'বলতে ঠিক সাহস হয় না।'

'কেন?' ঘাড়ের পিছনে আলতো ভাঁজ ফেলে চিবুক উঁচু করে তাকালো রেণু। চকিতে সুমিতের মনে পড়ে গেলো মায়ের কথা। চৈত্র মাসের সকালে মাটির এক ফুটোওয়ালা হাঁড়িতে জল ঢেলে মা এমন করে তাকাতেন। আর সেই ফুটো চুঁইয়ে একটা একটা করে জলের ফোঁটা পড়ত নিচের পাতা শুকিয়ে আসা তুলসীগাছে।

'কি জানি, হয়তো আপনি খুব সুন্দর বলে, সুন্দর এবং গম্ভীর।'

অনেকক্ষণ ডুবে থেকে হুস করে মাথা তুলে নিশ্বাস নিলে বোধহয়
প্র৬ এমন হয়, কথাটা বলতে পেরে সুমিত সেইরকম তৃপ্তি পেলো।
পড়েনি। 'যাঃ, আপনারা এমন বাজে কথা বলেন। আসলে আপনি খুব
বসন্তকালের সাহস টাহস নেই। তাই না?' হাসলো রেণু।

'তাই হবে। ছেলেবেলা মফস্বলে কেটেছে তো, ঠিক বুঝতে পারি না সাহসের এইসব ব্যাপার।'

'আমার নাম রেণু, রেণু রায়। আপনার নাম কিন্তু আমি জানি।' হাসলো রেণু।

'আপনার নামও আমি জানতাম।'

'আমি কিন্তু খুব খারাপ মেয়ে, খু-উ-ব।'

'যাঃ, এরকম মুখের মেয়ে কখনো খারাপ হতে পারে না।'

রেণু কাছে থাকলে কোলকাতাকে অন্য রকম লাগে। য়ুনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে পুরোন বই-এর সার সার দোকানের সামনে দিয়ে রেণুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাওয়া মানুষগুলোকে যীশু খ্রীষ্টের মত মহৎ মনে হয়। কফি হাউসের টেবিলে পাশাপাশি বসে চারপাশের একটানা চেঁচামেচিকে সমুদ্র গর্জনের মত নির্জন মনে হয়।

ওয়াই এম সি-এর রেস্তোরাঁর নির্জন কেবিনে বসে রেণু ওর কাঁধে মুখ রেখে একদিন বলে ফেললো, 'তুমি খুব ভাল, জানো, খুব ভাল।'

এক লক্ষ পদ্মফোটা সরোবরের মত বুকের ভিতরটা টলটল করে উঠলো সুমিতের। ঠিক, এমন করে কোন মেয়ে তাকে বলেনি কোনদিন।

'আমি খুব খারাপ মেয়ে, জানো?' রেণু আবার বললো।

'হুঁ।' রেণুর শরীরের গন্ধ (আহা, সুবাস বলে না কেন?) চোরের মতন বুক ভরে নিতে নিতে সুমিত বললো।

'সত্যি বলছি। দ্যাখো না, এই আমি যেচে তোমার সঙ্গে আলাপ করলাম। তুমি তো এতদিন শুধু দেখেই গেছ, এগিয়ে আসোনি তো। আমি কেমন নির্লজ্জের মত কথা বললাম।' রেণু কথাটা বলে মাথা সরিয়ে সোজা হয়ে বসলো। তারপর নিজের হাত দুটো চোখের সামনে ধরে হাতের রেখাগুলো দেখতে দেখতে

বললো, 'কি করব বল, ওই ক'দিন আসিনি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করলেই তোমার মুখটা মনে পড়ত। কি অস্বস্তি, শুতে বসতে নিস্তার নেই! মনে মনে বুঝলাম কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি। তারপর ক্লাসে এসে তোমাকে আবার দেখলাম। বুঝলাম আমাকে দেখতে পেয়ে তুমি খুশী হয়েছ, আর পারলাম না, জানো, তাই আমি নির্লজ্জ হয়ে গেলাম।' একটা হাত নামিয়ে সুমিতের হাতের ওপর রাখলো রেণু, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম।'

মাথার ওপর ছোট্ট পাখার হাওয়া রেণুব চুলগুলো নিয়ে খেলা করছিল। সুমিত সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো, এই রকম করে তুমি নির্লজ্জ হয়ে আমার কাছ থাক রেণু, আমি বেঁচে যাই।

রেণুব সঙ্গে দুপুরে অথবা আলো মরে আসা বিকেলে এই কোলকাতাব রাস্তায় হেঁটে গেছে ও। যুনিভার্সিটি থেকে হাঁটতে হাঁটতে রাসবিহারীর মোড়। ওখান থেকে বাসে চাপত রেণু। বালীগঞ্জ স্টেশনের কাছে ওদের বাড়ি, সেই অবধি কখনো যায়নি সুমিত।

'ভীষণ গোঁড়া জানো, বিশেষ করে মা, তুমি যদি ছাখো ভাবতেই পারবে না।' টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে রেণু বলছিলো। ওর খোলা চুলে গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণা মুক্তোর মত চকচক করছিলো, 'তুমি বিশ্বাস কববে না হয়তো, কিন্তু জানো, মা না এখনও ঘুম থেকে উঠে বাবার চরণামৃত খায়।' রেণুব মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছিলো সুমিতেব। কি বিশ্বাসে মানুষেরা এখনও বেঁচে থাকে!

'আর তোমার বাবা?' সুমিত জিজ্ঞাসা করছিলো।

'বাবার সঙ্গে আমার দেখাই হয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি নেই, রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে দেখি ফেরেননি। যা কিছু ব্যাপার তা ভায়া মা। শুধু রবিবার আমরা একসঙ্গে খাই। তখন প্রত্যেক সপ্তাহে খাওয়ার শেষে বাবা বলেন, 'বাইরের জগৎ নিয়ে বেশী মেতে থেকো না রেণু।' বোঝ! ঘাড় নাচাল ও।

'আর তোমার দাদা?'

'দাদা আমার মাইডিয়ার। ওর জন্যেই ও বাড়িতে থাকা যায়। ওকে আমি সব বলি, সব। এই, তোমার কথাও বলিছি।' রেণু সুমিতের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'সর্বনাশ, কি বলেছ ?' চোখ কপালে তুললো সুমিত।

'এই সব ব্যাপার। দাদা কি বললো জানো, বললো, 'একদম বাচ্চা ছেলে, এখনো কনসেপশন তৈরি হয়নি। তুই একটা পাগল।'

অশোক বলছিলো, 'তোদের কিন্তু দারুণ মানিয়েছে, কে বয়সে বড় বোঝা মুস্কিল। সুমিত, রেণু, অশোক আর খুব কম, ঝুমা নামের একটা মেয়ে একসঙ্গে আড্ডা দিত তখন। একবার অশোকের পরিকল্পনা মত কলেজ পালিয়ে ডায়মণ্ডহারবার চলে গিয়েছিলো ওরা।

ঠিক ছিলো ধর্মতলায় এসে বাস ধরবে সবাই। মনুমেন্টের সামনে দশটা না বাজতেই এসে হাজির হয়েছিলো সুমিত। তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। ও জায়গাটায় ছায়ার কোন ব্যবস্থা নেই। রোদ্দুরে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিলো ওর। চারপাশে ফেরিওয়ালারা ঘুরছে। একটা বৌ কচি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ওর সামনে হাত পাতলো। সুমিত দেখলো বৌটির গায়ের রঙ কোনকালে কালো ছিলো হয়তো, এখন ময়লা জমে জমে কেমন শ্যাওলা ধরে গিয়েছে। গায়ে জামা পরেনি অথবা নেই, বাচ্চাটা ওর শুকনো বুক নিয়ে খেলা করছে। পকেট থেকে পয়সা বের করতে গিয়ে সুমিত জিজ্ঞাসা করে ফেলল, 'তোমার দেশ কোথায় ?' ও ভেবেছিলো বৌটা পাকিস্তানের গল্প করবে নির্ঘাত। কিন্তু সে সেরকম কিছুই করল না, শিরাওঠা রোগা হাত বাড়িয়ে (যেটায় একটা শাঁখা বিচ্ছিরি রকমের সাদা) বলেছিলো, 'দক্ষিণে।' জায়গার নাম জানতে চেয়েছিলো সুমিত। বৌটা পয়সা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলছিলো, 'ডায়মণ্ডহারবার।'

চমকে উঠেছিলো ও। বৌটা চলে গেলে মনে মনে বলেছিলো, আমি তোমারি দেশে যাচ্ছি, তুমি যাবে ? সে তখন দূরে একটা

কাবুলিওয়ালার পেছন পেছন হাত বাড়িয়ে ঘুরছে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো ওর। এখন ওরা মজা করে বেড়াতে যাচ্ছে যেখানে সেখান থেকে একটি শেষযুবতী মেয়ে কলকাতায় চলে এসেছে না খেতে পেয়ে। না কি অন্যকিছু, কে জানে! এই সময় ও ঝুমাকে দেখতে পেলো। একটা মেয়েদের শান্তিনিকেতনী কাজ করা বড় হাতব্যাগ নিয়ে ঝুমা এল, 'কি ব্যাপার মুখ গোমড়া করে বসে আছেন একা, পার্টনার আসেনি?'

ঝুমার কথাবার্তাই এই রকম। ওর সঙ্গে তেমন মেলামেশা করেনি সুমিত, বরং এড়িয়েই গেছে অনেক দিন। সাজপোশাকে নিজেকে দেখানোর চেষ্টা আছে ঝুমার মধ্যে। এক একটা মেয়ে থাকে যাদের শরীরের বাঁধুনি ভাল এবং সেটাকে কাজে লাগানোর কায়দাকানুন তাদের ভাল করে জানা—ঝুমা সেই ধরনের মেয়ে। এখনো গালের মাঝখানে কয়েকটা ব্রণর দাগ কটা চোখের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গুছিয়ে আছে। সুমিত দাঁড়িয়ে থেকে বৌটাকে দেখছিল আর ঝুমা বললো, বসে আছে ও। এই রকমই কথাবার্তা। খুব সেজেছে ঝুমা।

সুমিত হাসলো, 'ওরা এখনি এসে পড়বে। এত কি এনেছেন?'

'সব, জামাকাপড়, তোয়ালে। যদি দরকার পড়ে, বলা যায় না। ধ্যুৎ, ওরা আসছে না কেন!' ঘুরে বাসগুলোকে দেখলো ঝুমা, 'তার চেয়ে বলুন আমরাই চলে যাই।'

'সেকি! কোথায়?' কপট বিস্ময়ে বললো সুমিত।

আর এই সময়েই ওরা এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ঝুমা বললো, 'ব্যস হয়ে গেল, আপনি আর চান্স পেলেন না।'

একটা খালি বাস পেয়ে গেলো ওরা। অফিসের সময় বলে ফেরার বাস খালি যাচ্ছে। সামনের সিটে অশোক আর ঝুমা, পেছনে ওরা। মেয়েরা জানলার ধারে বসেছে। বাস চলতে আরম্ভ করলে রেণু বললো, 'যদি কেউ দেখে ফ্যালে!'

ফিসফিস করে সুমিত বললো, 'তাহলে ঘোমটা দিয়ে নাও।'

চকচক করে উঠলো রেণুর চোখ। খালি বাসের দিকে চট করে নজর বুলিয়ে ও আঁচলটা মাথার ওপর দিয়ে ঘোমটার মত করে নিলো। বাসন্তী রঙের শাড়ির জমিতে ছোট ছোট কালো কড়ি আঁকা। আঁচলের একটা কোণা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, 'কেমন লাগছে গো?'

এক একটি মেয়ে আছে, যাদের গলা ঈষৎ লম্বা এবং গায়ের রঙে বিকেলের রোদ মাখামাখি, আঁচলের অর্ধেক বৃত্তে তাদের মুখ অপরূপ দেখায়। লোভীর মত কিছুক্ষণ দেখল সুমিত, রেণুর চোখে চোখ রাখলো। একচোখ হেসে রেণু কোন কথা না বলে আবার জিজ্ঞাসা করলো মুখ দুলিয়ে। একটা হাত ওর পেছনের সিটের ওপর রেখে সুমিত বললো, 'দারুণ। ঠিক বাচ্চা মেয়ের শাড়ি পরার মত বিউটিফুল।' এক ঝটকায় আঁচল খুলে ফেলে বাইরের দিকে তাকালো রেণু, 'অসভ্য।'

বেহালা ঠাকুরপুকুর একে একে ছাড়িয়ে ওরা দুপাশের ধানক্ষেতের ওপর চোখ রাখলো। বাসে এখন মোটামুটি ভীড়। বেশিরভাগ চাষীবাসী মানুষ। ডায়মণ্ডহারবারে এ ধরনের ছেলেমেয়ে দেখতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, মুখচোখ কোলকাতার মানুষের মত উদাস। সামনের সিটে অশোক আর ঝুমা চুপচাপ বসে। ঠিক বসে বললে ভুল হবে, ঝুমার শরীরের অনেকটা অশোকের ওপর চাপানো। সুমিত দেখলো, প্রায় অশোকের কাঁধে হেলান দেওয়া ঝুমার মাথার চুলে কিসব পুঁতির মালার টুকরো জড়ানো। এখন রেণুও চুপ করে বসে আছে। জানলা দিয়ে হুহু বাতাসে ওর কপালের ওপর চুলগুলো বানমাছের মত খেলা করছে। রোদের তাতে রেণুর চিবুক কী আদুরে দেখাচ্ছে। বুকের মধ্যে অনেক তৃপ্তি নিয়ে সুমিত চোখ বন্ধ করলো খানিক।

সারাটা দিন রোদে রোদে ঘুরে কেমন করে যেন ওদের কেটে গেলো। সবে গড়ে ওঠা একটা হোটেল-কাম-রেস্তোরাঁ নদীর গায়ে ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, দুপুরে ওরা সেখানে গিয়ে উঠলো।

রিক্সায় চেপে আসতে হয়েছে ওদের। দুটো রিক্সা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে কে আগে যেতে পারে। রেণুর উৎসাহ ছিলো বেশী। রিক্সাওয়ালাকে 'ভাই, আরো জোরে, সাব্বাস দাদা, ওদের হারিয়ে দাও' এইসব বলে উৎসাহ দিয়েছে। হোটেলটা নির্জন, এখনো মানুষজনের বসতি কাছাকাছি হয়নি। এপাশে নদী ওপাশে ধানজমি আর ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে বেশী বয়সের মহিলার সিঁথির মত নিরক্ত রাস্তা।

হোটেলে এসেই ঝুমা বললো, 'আর পারছিনা বাবা, আবার হাঁটলে আমার পা আমার থাকবে না।'

অশোক দাঁড়িয়েছিলো পাশে। বেতের সাজানো চেয়ারে ঝুমা ধুপ করে বসে গা এলিয়ে দিয়েছিল। ওদের মাথার ওপর একটা লাল নীল ডোরাকাটা কাপড়ে রোদঢাকা। জায়গাটা নদীর মুখোমুখি। হাওয়া দিচ্ছে খুব। রেণু আর সুমিত সামনের রেলিংএ ভর করে দূরের জাহাজ দেখছিলো। ঘাড় ঘোরালো সুমিত, ঝুমা হাত নেড়ে অশোককে মাথা নামাতে বললো। হোটেলের ভেতর থেকে একটা বেয়ারা ট্রেতে করে চা নিয়ে আসছে। ওরা ওঠার সময় বলে এসেছিলো লবিতে চা দিতে। অশোক মুখ নামালো। ঝুমা কি বলছে বুঝতে পারলো না সুমিত, তবে অশোক কথাটা শুনে হেসে উঠে ঝুমার গায়ে আলতো করে চড় মারলো তারপর চেঁচিয়ে বললো, 'গুড, গুড।'

চা খাওয়া হয়ে গেলে রেণু বললো, 'চল ঐ ভাঙ্গা লাইটহাউস দেখে আসি।'

'লাইট হাউস ভেঙ্গে গেলে দেখার কি আছে!' ঝুমা বললো।

রেণু কোন কথা বললো না প্রথমটা, তারপর হাসলো, 'শুনেছি ওর ওপরে উঠলে সমুদ্র দেখা যায়।'

সুমিত উঠে দাঁড়াল, 'চল সবাই, আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি।'

এখান থেকে অনেক দূরে নদী যেখানটা হঠাৎ চওড়া হয়ে গেছে সেখানে আবছা মত উঁচু গম্বুজ দেখা যায়। ঝুমা সেদিক চেয়ে চোখ

কপালে তুললো, 'আরে ব্বাস্'। আমার দরকার নেই বাবা ওখানে যাবার, মরে যাব ভাই একদম। তোরা যা। আমরা এখানেই থেকে যাচ্ছি।'

সুমিত একটু বিরক্ত হচ্ছিলো ঝুমার আলসেমির জন্য। একসঙ্গে বেড়াতে এসে এক-একজন এক এক রকম করবে এটা ঠিক নয়। ও অশোকের দিকে তাকালো। অশোকের ভূমিকাটা ও ঠিক বুঝতে পারছে না। ও অশোককে বললো, 'কিরে।'

যেন নদী দেখছে এইভাবে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অশোক ঘাড় ঘুরিয়ে সুমিতকে ডাকলো, 'শোন ।'

সুমিত যেতেই অশোক বললো, 'তোরা ঘুরে আয়।'

'এই রোদ্দরে এখানে বসে থাকবি তোরা!' সুমিত রাগ করছিলো।

'ধ্যুৎ, রোদ্দুরে কেন! এটা তো হোটেল, ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। তোরা যাবার সময় আমাদের ডেকে নিস।' হাসলো অশোক।

'ঘর ভাড়া করে কি করবি—পয়সা নষ্ট।' সুমিত বললো।

'ঝুমার ইচ্ছে ঘরে বসেই সমুদ্র ছাখে। প্রত্যেকের তো ভিন্ন ভিন্ন রুচি আছে, আমরা তো সেখানে বাধা দিতে পারি না। ঝুমা ভাই এক্সপেরিয়েন্সড মেয়ে, এরকম চান্স ছেড়ে দেওয়া যায়, বল?' আবার চোখ কুঁচকে হাসলো অশোক, 'তুইও একটা ঘর নে না।'

চমকে উঠলো সুমিত। এই ব্যাপারটা ওর খেয়ালই হয়নি। মনে পড়লো, ঝুমা তোয়ালে শাড়ি এনেছে সঙ্গে। একদিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে এসে এসব আনে না। তাহলে কি ওরা আগের থেকেই এই রকম পরিকল্পনা করে নিয়েছিলো। এক ঘরে ওরা একা কিছুক্ষণ থাকবে, ঝুমার জামাকাপড় সঙ্গে নিয়ে আসা আর অশোকের চোখ কুঁচকে হাসি সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে সুমিতের কাছে। অশোক ওর বন্ধু। ওরা এক সঙ্গে কলেজ থেকে পড়েছে। সেই অশোককে বুঝতে ওর কষ্ট হচ্ছিলো। অশোক

কবিতা লেখে, য়ুনিভার্সিটি পত্রিকার সম্পাদক, দারুণ ব্রাইট ছেলে। সুমিতকে সঙ্গে করে ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াতে আসার উদ্দেশ্য যে এটাই হবে—গুলিয়ে যাচ্ছিলো সুমিতের। ঝুমার দিকে তাকালো ওই বেতের চেয়ারে মাথা পিছনে হেলিয়ে বসে আছে ঝুমা। হঠাৎ ওর মনে হলো ঝুমাকে ঠিক সমবয়সী ছাত্রী বলে মনে হয় না, ওর কোমরের যে ভাঁজ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে বা গলার খাঁজ, বুকের আদল, কয়েকমাস বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের মতন পুরুষ্ট। অশোক বললো, 'ঝুমা অভিজ্ঞ। হতে পারে, চাষীরা মেঘ দেখে বলে দেয় বৃষ্টি হবে কি না।' রেণু ওর দিকে এগিয়ে আসছে, সুমিত দেখলো। রেণু কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ওর মুখ চোখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ঝুমা অবশ্য রেণুর বন্ধু নয়, মেলা-মেশাও কম, তবু ওর মনে কি কিছু হচ্ছে না? খুব সহজ গলায় রেণু বললো, 'চল, আমরা বেড়িয়ে আসি।'

সুমিত কিছু বলার আগেই অশোক বললো, 'তোরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঘুরে আয়, চারটের বাস ধরব।

সুমিত আর রেণু নিচে নেমে এলো। সুমিত একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরে তাকালো, না ওদের দেখা যাচ্ছে না। রেণু বললো, 'চল, হাঁটি।'

নদীর ধার দিয়ে নরম মাটির রাস্তা চলে গিয়েছে বাঁ দিকে মাঠ রেখে। ওরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। রেণুর মুখ একটু গম্ভীর, সুমিত ইচ্ছে করেই কথা বলছিলো না। ওপাশে গরু চরছে, একরাশ ছাগল গলার ঘণ্টা বাজিয়ে ওদের দিকে আসছে। রেণু সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, 'এই মারবে না তো।' সুমিত হেসে বললো, 'ধ্যুৎ, ছাগলের সে-সব বুদ্ধি আছে নাকি।'

টুং টাং ঘণ্টাগুলো বাজছে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো। একটা বাচ্চা ছেলে ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। মাথার ওপর চাঁদিসেঁকা রোদ, ওপাশের নদীতে জেলে নৌকো ভাসছে। ছাগলরা গা ঘেঁষাঘেষি করে রাস্তাজুড়ে ওদের মধ্যে এসে পড়লো। হঠাৎ

রেণু সুমিতের হাত ধরে ফেললো, একটা বড়সড় ছাগল ওর গা ঘেঁসে চলে যাচ্ছে। জলস্রোতের মত ওরা সুমিতদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেলো। যাবাব সময় বাচ্চাটা রেণুর দিকে হলদে দাঁত বের কবে হেসে গেলো। বেণু ভয় পেয়েছে বাচ্চাটা ধরতে পেরেছিলো।

আর একটু এগোলেই বাঁ দিকে ধানক্ষেত। আলের মত উঁচু বাস্তায় ওবা হাঁটছিলো। দূবে এখনো অস্পষ্ট হয়ে আছে ভাঙ্গা লাইটহাউস। হঠাৎ বেণু বললো, 'ঝুমাকে কেমন লাগল।'

সুমিত ওব দিকে তাকালো একবার, কিন্তু উত্তর দিলো না কিছু।

'আমার খুব লজ্জা করছে, তুমি কিছু মনে করো না। হ্যাঁ?' রেণু আবার বললো, 'ও ওইরকম মেয়ে। অশোক কিভাবে ওকে নিয়েছে জানি না তবে মন থেকে নিলে বিপদে পড়বে।'

'কেন?' সুমিত ওর দিকে ফিরলো।

'ঝুমাব এ্যাম্বিশন অনেক। মেয়েবা সবাই জানে প্রফেসর ভট্টাচার্যেব সাবজেক্টে ও লেটাবমার্কস পাবে।'

'এখন থেকেই কি কবে জানলে।' সুমিত অবাক হলো।

'প্রফেসর ভট্টাচার্য প্রত্যেকবার দু-একটা মেয়েকে লেটার মার্ক দেন, তারপর ওরা ওঁর আণ্ডারে রিসার্চ কবে। অনেকে ঝুমাকে ওঁর সঙ্গে একই চেয়ারে ছুটির পর বসতে দেখতে পেয়েছে।' রেণু হাসলো।

সুমিত বলল 'যাঃ।' ওর মনে পড়লো প্রফেসর ভট্টাচার্য ষাটের কাছাকাছি, দেখতে প্রায় বৃদ্ধ, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। ওর নামে অশোকই অনেক কিছু বলছে, কিন্তু ঝুমার সঙ্গে—। রেণু ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমরা ছেলেরা, ইচ্ছে করলে মনে মনে চিরকাল তরুণ থাকতে পার, তাই না? বড় অতৃপ্তি তোমাদের।'

সুমিতের ইচ্ছে হল বলে, ঝুমার চেয়েও।' কিন্তু এখন আর এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগছে না। দুধেল ধানগাছগুলোর

শরীর নিংড়ানো বাতাস নদীর জলের সঙ্গে খেলা করে যায়, অনেক দূরে গিয়ে রঙা আকাশের গায়ে একটা চিল কি আসলেমিতে গা এলিয়ে দেয় আর রেণুর নাকের গায়ে চিকচিকে ঘামের বিন্দু নাকছবির মত সুন্দর দেখায়—এইসব সম্রাটের মত আগলে রাখতে চাইছিলো ও।

সুমিত বললো, 'রেণু, আমি কিন্তু খুব সাধারণ ছেলে।'

'উহুঁ' ঘাড় নাড়লো রেণু।

'মানে ?'

'সাধারণ হলে তোমাকে আমি ভালই বাসতাম না। কাউকে ভালবাসলে মানুষ আর থাকে না। আচ্ছা আমাকে না দেখতে পেলে তোমার কেমন লাগে ?'

'কষ্ট হয়।'

রাত্রিবেলায় যখন একা বিছানায় শুয়ে থাক তখন আমাকে ভাবো !'

'তুমি ?'

কোন উত্তর দিল না রেণু। হাঁটতে হাঁটতে ঝুঁকে পড়ে একটা লম্বা ঘাস ছিঁড়লো। তারপর সেটার সবুজ তাজা ডাঁটিটা ঠোঁটের কোণে চেপে বললো, 'আচ্ছা, আমি যদি এখন মরে যাই তুমি চিরকাল আমার কথা ভাববে ? অন্তত এই সব মনকেমনকরা দিনগুলোর কথা, ভাববে ?'

সুমিতের বুকের মধ্যে কেমন ভুরু ভুরু করছিলো, ভয় হচ্ছিলো রেণুর গলার স্বর শুনে, এই রেণুকে ও চেনে না. 'একথা বলছ কেন ?'

'মনে হল তাই, আমি যে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না।" কথাটা বলেই সুমিতের মুখের দিকে তাকালো রেণু। তাড়াতাড়িতে অনভ্যস্ত হাতে দাঁড়ি কামাতে গিয়ে সুমিতের চিবুকের ওপব একটা কাটা দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে, সেদিকে চোখ রেখে কি ভাবতে ভাবতে হেসে ফেললো ও, 'ছেড়ে দাও এসব কথা, আমার না বেশী আশা করতে খুব ভয় হয় তাই বলে ফেললাম।'

এখান থেকে ভাঙ্গা লাইটহাউসটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রেণু বললো, 'চল দৌড়োই, কতদিন দৌড়োই না। স্কুলে পড়ার সময় একবার মধুপুর গিয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য, তখন খুব দৌড়তাম। দৌড়াবে?' বাচ্চা মেয়ের মত আঁচল কোমরে গুঁজলো ও, জুতো খুলে হাতে নিলো। সুমিত হাসলো, 'তুমি এগোও, আমি তোমাকে ধরছি।'

'তুমি পারবে না।' বলে রেণু দৌড়োতে লাগলো। আলপথের ওপর দিয়ে ওর হালকা লম্বা শরীর ছুটে গেলো সামনে, সুমিত দেখলো। ক্রমশ রেণু দূরে চলে যাচ্ছে, ওর খোলা চুল বাতাসে উড়ছে, ছুটতে ছুটতে ও ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলো 'এসো-ও।' সুমিতের দৌড়োতে ইচ্ছে করছিলো না, রেণুর ছুটে যাওয়া শরীরটা দেখে ওর কেমন ভয় করছিলো, মনে হচ্ছিলো ওদের মাঝখানে একটা ব্যবধান হঠাৎ তৈরি হয়ে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দূরত্বটা কমানোর জন্য ও ছুটতে শুরু করলো। রেণু বুঝতে পারলো সুমিত আসছে, ও আরো জোরে ছুটতে শুরু করলো। নদীতে ভেসে যাওয়া নৌকোর জেলেরা এই দৃশ্য দেখতে পেলো। ধানক্ষেত থেকে ছটফটিয়ে ওড়া গঙ্গাফড়িংগুলো আচমকা ভয় পেয়ে চুপ মেরে গেলো। রেণুর ব্যবধান কমে আসছে। রেণু, রেণু, রেণু। বুকের মধ্যে একরাশ তৃপ্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সুমিত দেখলো, হোঁচট খেয়ে রেণু উল্টে পড়ে গেলো আলপথ থেকে পাশের ধানক্ষেতে। পড়তে পড়তে চিৎকার করে উঠলো, 'ও মাগো!'

বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো সুমিতের। ও এক নিশ্বাসে রেণুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। রেণু উঠে বসে দু'হাতে ডান পা আঁকড়ে ধরে যন্ত্রণায় দাঁত চেপে ওপরের দিকে তাকাতেই সুমিত ঝুঁকে পড়লো, 'কি হয়েছে তোমার, এই, রেণু!' সুমিত হাঁপাচ্ছিলো। চোখাচোখি হতেই রেণু একটু একটু করে হাসল। সুমিত দেখলো, রেণুর হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। চট করে বসে পড়লো ও, জোর করে রেণুর হাত সরিয়ে

দিলো, 'দেখি দেখি কি হয়েছে।' রেণু হাত সরিয়ে নিয়ে চোখের সামনে ধরলো, আঙুলের পাশগুলো লালচে হয়ে গেছে, 'দেখেছ আমার শরীরে কত রক্ত!' সুমিত দেখলো ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের পাশটা কেটে গেছে, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরল ও কাটা মুখটার ওপর। ভিতরের সাদা মাংস অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। রেণু আর চিৎকার করছে না। সামনের দিকে পা ছড়িয়ে সুমিতের নার্ভাস হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। রক্তটা একটু বন্ধ হতে না হতে রুমালের অর্ধেকটা ভিজে লাল হয়ে গেলো। রেণু বললো, 'তোমার রুমালটা নষ্ট করে দিলাম।' সুমিত ভাল করে বুড়ো আঙুলটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলো। রক্তটা বন্ধ হলেও একটু একটু ভিজে থাকল রুমালটা। হাত বাড়িয়ে রেণুর হাত ধরে ওকে টেনে তুললো সুমিত, 'এবার উঠে দাঁড়াও ম্যাডাম'।

পায়ের গোড়ালিতে ভর করে উঠে দাঁড়ালো রেণু। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আলপথের ওপর উঠে এলো। ওর শাড়িতে পাছার কাছে শুকনো মাটি দাগ এঁকে দিয়েছে, কনুই-এর কাছে মাটি লেগে আছে। রেণুর চটি দুটো কুড়িয়ে সামনে রেখে সুমিত বললো, 'হাঁটতে পারবে তো, ছাখো।' 'না পারলে?' রেণু হাসলো, বোঝা যাচ্ছিলো ওর কষ্ট হচ্ছে একটু, 'আমায় কোলে নিয়ে যেতে পারবে?'

'উপায় না থাকলে করতে হবে।' সুমিত দেখলো সামনেই নদীর বুকে একটা ছোট নৌকো জেলে ভাসছে আর তার ওপর দাঁড়িয়ে একটা দাড়িওয়ালা বুড়ো ফোকলা দাঁতে হাসছে। লোকটা নিশ্চয়ই রেণুকে পড়ে যেতে দেখেছে। সুমিতের রাগ হচ্ছিলো লোকটার ওপরে কিন্তু লোকটা মুখের কাছে দুহাত জড়ো করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'খুব বেশী লাগেনি তো মা!'

নৌকোটা পাড় থেকে অনেকটা দূরে। বাতাসে শব্দটা অনেক ক্ষীণ শোনালো। রেণু দেখতে পেয়েছিলো লোকটাকে, ঘাড়

নেড়ে বললো, না। তারপর বললো, 'কেমন স্নেহপ্রবণ লোক, না?'

সুমিত কিছু বললো না। ও বুঝতে পারছিলো না ভাঙ্গা লাইটহাউসের দিকে আর যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা। চটি হাতে নিয়ে গোড়ালীর ওপর ভর করে রেণু কতটা হাঁটতে পারবে? তা ছাড়া এব মধ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। অশোক চারটের বাস ধববে বলেছে। হঠাৎ ওর খেয়াল হল ওরা এখন কি করছে? অশোক আর ঝুমা! ভাবতে গিয়েই ওব কান লাল হয়ে উঠলো। ও বেণুর দিকে তাকালো। পড়ে যাবার পব রেণু এখনো অগোছালো হয়ে আছে, রেণুর বুক থেকে সরে যাওয়া কাপড় এখন হাতের ওপর বাতাসে দোল খাচ্ছে। চট করে চোখ সরিয়ে নিলো সুমিত। রেণু যে কোন যুবতী মেয়ের মতন পূর্ণতার সীমা পেরিয়ে গেছে। যুনিভার্সিটিব শেষ গণ্ডী না পার হওয়া অববি ওবা মেয়ে থাকে, নেহাত মহিলা হয়ে যায় না, এই যা।

বেণু বললো, 'তোমার খুব লজ্জা, না?'

কেন?'

'চোখ সরিয়ে নিলে তো, তাই।' কাপড় ঠিক করে রেণু বললো, 'কই বললে না তো আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে কি না।'

কি বলতে গিয়ে সুমিত হেসে ফেললো, 'যা একখানা চেহারা করেছ, রবীন্দ্রনাথ হলে বলতেন, তোমার ও বডি যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি—আমি হেলপলেস।'

হেসে উঠলো রেণু, 'তাহলে আমি তোমার কাঁধে ভর করলাম, একটু হেলপ করো না হয়।' রেণু একটা হাত সুমিতের কাঁধের ওপর পাখির ডানার মত ছড়িয়ে দিলো। সুমিত রেণুব কোমরের কাছে আলতো করে হাত রেখে ওকে নিয়ে হাঁটতে লাগলো লাইটহাউসের দিকে। এখন রেণুর শরীর ওর সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। ওর হাতের তালুর তলায় রেণুব কোমরের একরাশ মাখন কি উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে। ওর দমবন্ধ হয়ে আসছিল,

রেণুর শরীর থেকে এক লক্ষ কস্তুরী হরিণ বেরিয়ে আসছে তাদের মাতাল সুবাস নিয়ে। বুকের পাশে হঠাৎ হঠাৎ ফুলের তোড়ার মত নরম স্পর্শ ওর রক্তে টোকা দিয়ে যাচ্ছিলো। ওর মনে হল এইভাবে ও যদি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, এইভাবে।

জলে শব্দ তুলে নৌকোটা পাড়ের কাছে চলে এলো। ওরা দেখলো বুড়ো লোকটা আস্তে আস্তে বৈঠা বেয়ে একদম মাটির কাছে নৌকো ভিড়ালো। ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। সুমিত রেণুর কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিলো, দেখাদেখি রেণুও। নৌকোটা ছোট, একটা ভেজা জাল মাঝখানে পড়ে আছে। বুড়ো হাত জোড় করে হাসলো, 'কোথায় যাওয়া হবে?'

বিরক্ত হতে পারতো সুমিত। কিন্তু লোকটার কথা বলার ধরণ, হাত জোড় করে নমস্কার করা এই সব ওর কণ্ঠস্বরকে নরম করতে সাহায্য করলো, 'ঐ ভাঙ্গা লাইটহাউসে যাব।' তারপর সাফাই গাওয়ার মতন বললো, 'এমনি বেড়াতে।'

ঘাড় নাড়লো বুড়ো, 'ওটার সিঁড়িটা গেল বছর কোলকাতার কিছু মেয়ে মদ্দ এসে ভেঙে রেখেছে। তুমি মা উঠতি পারবা না।' তারপর রেণুর পায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'পাটারে তো জখম ভালমতনই করিছো, হাঁটতি পারবা?'

সুমিত হেসে ফেলল, 'কি আর করা যাবে!'

'তা আসা হচ্ছে নিশ্চয় কোলকাতা থেকে, নয়?' বুড়োব দাড়ি বাতাসে দুলছিলো। চোখ দুটো সুমিতের দিকে। সুমিত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো।

'তা আমি বলি কি, মায়ের যখন এই অবস্থা, আমারে দুটো ট্যাকা যদি দাও তোমাদের নৌকাবিলাস করিয়ে দিতে পারি।' বলে বুড়োর যেন খুব মজা লেগেছে এমন করে মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগলো।

'নৌকো করে। বাঃ, দারুণ হবে। এই চল না।' রেণু খুশীতে সুমিতের হাত ধরলো। সুমিতের প্রস্তাবটা আশাতীত মনে হচ্ছিলো। অন্তত হোটেলের ঘাটে নৌকো করে গেলে রেণুকে

হাঁটতে হবে না। ও একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললো, 'আমরা কিন্তু ঐ যে বড় হোটেল বাড়ি, ওখানে যাব, নামিয়ে দেবে তো ?

'ঠিক আছে বাবা।' লোকটা নেমে পড়লো মাটিতে, নেমে নৌকোর একটা দিক শক্ত করে ধরলো। আলপথ থেকে ওরা সাবধানে নিচে নেমে এলো। রেণু ঢালু মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে সুমিতকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছে। ওর শরীর ভয়ে কাঁপছে টের পেল সুমিত। একটা পা নৌকোয় রাখতেই নৌকো দুলে উঠলো' 'ডুবে যাবে না তো! রেণু আঁতকে উঠলো।

'কত তুফান গেল মা, এ নৌকোর প্রাণ কাছিমের মত শক্ত।' বুড়ো বললো। শরীরের ভার ঠিক রেখে সুমিত রেণুকে তুলে নিলো নৌকোয়, নিয়ে মাঝখানে গুছিয়ে বসলো। বুড়ো এবার নৌকো বৈঠার ডগা দিয়ে পাড় থেকে ঠেলে সরিয়ে আনলো, তারপর এক প্রান্তেব গলুই-এ বসে বৈঠা বাইতে লাগলো চুপচাপ।

প্রথমটায় আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকলেও এক সময় রেণু সহজ হল। দুপাশে জলের দাগ রেখে নৌকোটা মাঝ নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জলজ বাতাস ওদের শরীরে ঠাণ্ডা আমেজ আনছিলো, যদিও রোদ এখনও চাবধারে ছড়িয়ে আছে। নৌকো থেকে আঁশটে গন্ধ উঠছে, বোধহয় জালের তলায় ধরা মাছ রাখা আছে। বুড়ো মাঝে মাঝে তার পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলো। পাকা দাড়ি লম্বা হলেই সুমিতের রবীন্দ্রনাথেব কথা মনে পড়ে।

একসময় ওপাশের ধানক্ষেত অনেকটা দূরে সরে গেলো। ডানদিকে ভাঙ্গা লাইটহাউস আর বাঁদিকে অস্পষ্ট হোটেলবাড়িটা দেখা যাচ্ছে। আশে-পাশে দু'একটা জেলে নৌকো ভাসছে। মাঝ নদী দিয়ে একটা ছোট জাহাজ যাচ্ছে গম্ভীর মাছের মত। তার ঢেউগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে এত দূরে এসে ওদের নৌকোকে দোল দিয়ে যাচ্ছে। রেণু নড়েচড়ে বসলো। তারপর এক হাতে সুমিতকে আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে ঝুঁকে পড়ে জল স্পর্শ করলো, 'আঃ দ্যাখো কি ঠাণ্ডা।'

আর ঠিক তখনই সুমিতের মনে পড়লো ওর কুষ্ঠিতে জলে ডুবে মৃত্যু হবার একটা ফাঁড়ার কথা লেখা আছে। ছেলেবেলা থেকে এই ভয়ে ওর সাঁতার শেখা হয়নি। মুখ ঘুরিয়ে সুমিত বললো, 'বেশী ঝুঁকো না, নৌকো উল্টে যাবে।'

সেই সময় বুড়ো বললো, 'না, না, মা আমার পাখির মত হালকা। হাতটা ধুয়ে নিলে হয়, মাটি নেগে আছে।'

রেণু কনুই ঘুরিয়ে দেখলো। তারপর জল তুলে তুলে ধুয়ে নিলো হাতটা। সুমিত রেণুর কোমরের কাছে হাত রেখে সামনে পা ছড়িয়ে দিলো। আঃ! হঠাৎ ওর নজর পড়লো বুড়োর ওপর, একদৃষ্টে চেয়ে আছে রেণুর দিকে। কি দেখছে লোকটা? ওর হঠাৎ মনে হলো, এই সব মাঝিরা ইচ্ছে করলেই শয়তানি করতে পারে। যদিও বয়স হয়েছে ওর, তবু জলের ওপর ও এখন ওদের ভয় দেখাতে পারে, টাকা পয়সা ছিনতাই করতে পারে। এখন প্রায় মাঝনদীতে এসে পড়েছে ওরা, চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। ও ভাবল রেণুকে একটু সাবধান করে দেয়, কিন্তু ও অবাক হয়ে শুনলো রেণু গুন গুন করছে জলের দিকে তাকিয়ে। জলের গায়ে রেণুর কাঁপা কাঁপা ছায়াটা পাশাপাশি চলছিলো। একটা মাছধরা পাখি ঠিক মাথার ওপর দিয়ে পাক খেয়ে গেলো আচমকা। বুড়ো এখন আর বৈঠা বাইছে না, হালের মত ধরে আছে। হঠাৎ নরম নরম গলায় ও বললো, 'মা যদি দোষ না নেয় তবে বলি একটু জোরেই হোক না কেন, সুখ বল আর দুঃখই বল মনের মধ্যে বন্দী রাখতি নেই।' ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখলো রেণু, তারপর হেসে ফেললো। বললো, 'আমার মুড এসে গেছে, এই তুমি হাসবে না বলো?'

'আমি চোখ বন্ধ করে আছি।' সুমিত বললো।

একটা চিমটি কাটলো রেণু ওর হাতে। তারপর নদীর ওপর চোখ রেখে গেয়ে ফেললো, 'সখী, ভাবনা কাহারে বলে। সখী, যাতনা কাহারে বলে।' এর আগে কখনো রেণুর গান শোনেনি সুমিত।

মাঝে মাঝে পথ চলতে একটু গুনগুন করেছে এইমাত্র। এখন এই খোলা নদীর বুকে নৌকোয় বসে সারা শরীরে বাতাসের স্পর্শ নিয়ে কুচি কুচি কাগজের মত জলের ফেনা দেখতে দেখতে ওর মনে হলো রেণু খুব দুঃখী, দুঃখ না থাকলে কেউ এই সুন্দর গান গাইতে পারে না। এত ভালবাসার কথা তবু গানের ভিতর থেকে এক বিষন্ন মেজাজ এসে চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। রেণু যখন গাইলো, 'আমার মতন সুখী কে আছে। আয় সখী, আয় আমার কাছে' তখন অদ্ভুত একটা কান্না শামুকের মত মুখ চোখ বন্ধ করে বসেছিলো। এক সময় যখন গান শেষ হয়ে গেলো, যখন সব চুপচাপ, শুধু বুড়ো বৈঠা ধরে আস্তে আস্তে নাড়ছে: তখন সুমিতের মনে হলো একটাই লাইন ঘুরে ফিরে বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে ফিরে ফিরে আসছে—ভালবাসা কারে কয়! সুমিত রেণুর হাত শক্ত করে মুঠোয় আঁকড়ে ধরলো।

হোটেলের ঘাটে নেমে সুমিত বুড়োকে দুটো টাকা দিলো। টাকাটা কেমন নিস্পৃহের মত নিয়ে বুড়ো বললো, 'আর তো দেখা হবে না বাবু।'

সুমিত ভাবলো ও আরো টাকা চাইছে, বললো, 'ঠিক আছে, আবার যদি আসি তখন তোমার নৌকোয় চড়বো।'

'আমি তো থাকবো না' বুড়ো ঘাড় নাড়লো, 'এই শীতেই আমি মরে যাবো, কাকদ্বীপের ফকির গুণে বলেছে'। বলে বুড়ো নৌকোটা জলে নিয়ে গেলো পাড়ে বৈঠা ঠেলে। সুমিত চমকে উঠেছিলো কথাটা শুনে, কি সাধারণ গলায় লোকটা বলে গেল ও মরে যাবে। রেণু একটু এগিয়ে গিয়েছিলো, পিছন ফিরে ডাকল, 'এই!' খুব খারাপ লাগছিলো সুমিতের, ও তাকিয়ে দেখলো নৌকোটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে আর বুড়োর মুখটা নদীর দিকে ফেরানো, এখান থেকে বাতাসে ওর সাদা দাড়ির প্রান্ত মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। রেণু আবার ডাকলো।

হোটেলের সামনে ওরা দাঁড়িয়েছিলো। সুমিতদের দেখেই

অশোক ঘড়ি দেখলো, 'ক'টা বাজে খেয়াল আছে? কোথায় ঘুরছিলি!'

সুমিত দেখলো অশোককে বেশ চকচকে দেখাচ্ছে, মাথার চুলগুলো সুন্দর করে আঁচড়ানো। স্নান করার পর শরীরে যে জৌলুস আসে এখন অশোককে দেখলে তা বোঝা যায়। দুটো রিকশা সামনে দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছে অশোকই ওদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ঝুমা এক পায়ে ভর রেখে শরীরটা ঈষৎ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। চোখাচোখি হতেই হাসলো। চমকে উঠে রেণুর দিকে তাকাতেই রেণু মুখ ফিরিয়ে হোটেলের দিকে তাকালো। শাড়ি বদলেছে ঝুমা, খুব পাতলা একটা গা-পিচ্ছিল শাড়ি পরেছে এখন। টকটকে লাল। শেষ বিকেলের রোদ সেটাকে আরো লকলকে করে তুলেছে। হাতকাটা জামা পরায় চোখের দৃষ্টি ওর নিটোল ফরসা হাতের ডানায় গিয়ে পড়বেই। য়ুনিভার্সিটিতে কোন মেয়েকে নাভির তলায় শাড়ি পরতে দ্যাখেনি ও। এখন ঝুমা পরেছে। কিন্তু কোমরের ওপর ওর নিয়মিত শাড়ির বাঁধুনির দাগ চোখে পড়ে গেলো সুমিতের। ঝুমাকে কি খুব তৃপ্ত দেখাচ্ছে? ওর মনে পড়লো ওদের হোস্টেল লাইব্রেরীতে আবুল হাসনাতের মোটকা বইটা এসেছে—পড়ে দেখতে হবে।

দুলে দুলে ঝুমা রেণুর কাছে এগিয়ে এলো, 'কি ভাই, ডুবে ডুবে জল খাওয়া, না?' রেণু অবাক হলো, 'মানে?'

'কাপড়টার কি অবস্থা করেছ, যে দেখবে সেই বুঝবে।' ঝুমা হাসলো।

'বুঝুক।' রেণু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রিকসায় উঠে বসলো। সুমিত লক্ষ্য করলো ও আঙুল কেটে যাওয়ার ব্যাপারটা বললো না। সুমিত ভেবেছিলো এখানে ফিরে এসে হোটেল থেকে ওষুধ চেয়ে নিয়ে রেণুর পায়ে লাগিয়ে দেবে। কিন্তু এখন রেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো রেণু চায় না যে, এটা ঝুমাও জানুক।

অশোক দাম মিটিয়ে দিয়েছিলো। 'যা খরচ হবে কোলকাতায়

ফিরে শেয়ার হবে। অবশ্যই ঘর ভাড়া নেবার টাকাটা ওরাই দেবে। ঝুমা গিয়ে রেণুর রিকসায় উঠলো। উঠে বললো, 'এবার আপনারা দুই বন্ধু একসঙ্গে যান।' ওদের রিক্সাকে আগে যেতে দিয়ে অশোক একটা সিগারেট দুবারের চেষ্টায় ধরিয়ে বললো, 'খাবি?' ঘাড় নাড়ল সুমিত, না। চোখ বন্ধ করে একমুখ ধোঁয়া টেনে অশোক বললো, 'বুঝলি সুমিত, দা-রু-ণ।'

সুমিত কোন কথা বললো না। ও দেখলো নদী থেকে ক্রমশঃ দূরে চলে আসছে ওরা। এখন ভরা বিকেলে নদীর ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসা ছায়ায় ছোট ছোট নৌকোগুলোকে আলাদা করে চেনা কঠিন। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সেই দাড়িওয়ালা বুড়োকে দেখবার চেষ্টা করলো ও। এখন সব অস্পষ্ট।

মনুমেন্টের তলায় ওরা যখন ফিরে এলো তখন রাত হয়ে গিয়েছে। বাসে বসেই রেণু ছটফট করছিলো। ফেরার সময় ভিড় ছিল খুব। কথা বলার সুযোগ ছিল না একদম। রেণু মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছিলো। বাস থেকে নেমে রেণু বললো, 'আজ কপালে কি আছে কে জানে!'

সুমিত বললো, 'পৌঁছে দিয়ে আসবো?'

রেণু ঘাড় নাড়লো, 'মাথা খারাপ। একাই চলে যাব।'

অশোক বললো, 'চল ট্যাকসি করি।' অশোক থাকে ঢাকুরিয়ায়। ওদের যেতে হবে একই দিকে। রেণু বললো, 'না না ট্রামেই চলে যাব'। অশোক ঝুমার কাছে গিয়ে নিচু গলায় কি বলতে ঝুমা হেসে উঠলো। রেণু বললো, 'চলি।'

সুমিত বলতে চাইছিলো ও কোনদিন আজকের কথা ভুলবে না। কিন্তু ও বললো, 'কাল আসছ তো।'

এগিয়ে আসা একটা ট্রামের দিকে তাকিয়ে রেণু বললো, 'হ্যাঁ।' তারপর ফিসফিস করে বললো, 'সকালে ভেবেছিলাম আমি ঝুমার মতো হবো। কিন্তু পারলাম না, তুমি খুব ভাল, খু-উ-ব।' ট্রামটা এসে দাঁড়াতেই রেণু উঠে পড়লো। 'সুমিত দেখল অশোকও

ট্রামটায় উঠছে, 'সুমিত, তুই তো নর্থে যাবি, ওকে পৌঁছে দিস।' কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে অশোক চলে গেলো।

ট্রামটা চলে গেলে সুমিত দেখলো অন্ধকারে ঝুমা দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাশে দুটো লোক ঘুরঘুর করছে। লোক দুটোর ভাবভঙ্গি ভাল নয়। সুমিতকে দেখে ওরা সব দাঁড়ালো। সুমিত বললো, 'চলুন।'

ওরা চৌত্রিশ নম্বর বাসস্ট্যাণ্ডের সামনে এসে দাঁড়ালো বেশ লোক জমে গেছে, বাস নেই। ঝুমা বললো, 'আপনি হেঁদোর কাছে থাকেন না?'

সুমিত ঘাড় নাড়লো। ঝুমা গ্রে ষ্ট্রীটে থাকে, অশোক ওকে বলেছে। 'ট্রামে গেলেও তো হয়।' সুমিত বললো।

'ট্যাক্‌সি দেখুন না, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। ট্যায়ার্ড।' ঝুমা গলাটা ক্লান্ত করে বললো। সুমিত ঝুমার দিকে তাকালো। ঘুম পায় নাকি, কে জানে? ওরা এগিয়ে এলো মেট্রোর কাছাকাছি। সুমিত বললো, 'ট্রামে গেলেই হতো, শুধু শুধু খরচ করে লাভ আছে।'

“ইস, আপনি তো দারুন কিপ্টে।' ভ্রুকুটি করলো ঝুমা।

'পয়সা পেলে তো কিপ্টেমি করব।' হাসলো সুমিত।

'আপনাকে কে দিতে বলেছে, আপনার বন্ধুকেও আমি খরচ করতে দিই না।'

একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেল ওরা। ট্যাক্সিতে উঠে সুমিত দেখলো সেই লোক দুটো পিছন পিছন এতদূরে এসেছে। কেন? ধর্মতলায় সন্ধের পর একধরনের মেয়ের পিছনে এইসব লোকগুলো ঘোরাফেরা করে। ঝুমাকে ওরা কি ভেবেছে।

মাঝখানে অনেকটা ব্যবধান রেখে সুমিত বসেছিলো। ঝুমা শরীর এলিয়ে দিয়েছে জানলার ধারে। হঠাৎ ও বললো, 'রেণু খুব ঠাণ্ডা মেয়ে না।

'ঠাণ্ডা মানে?' সুমিত প্রশ্নটা বুঝতে পারলো না।

'শীতল।' আস্তে করে বললো ঝুমা। এবার ধরতে পারলো ও. একটা রুক্ষ কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেললো, 'ঠিক ভাবিনি।'

'ভেবে দেখবেন।' ঝুমা মুখ ফিরালো রাস্তার দিকে, 'ওকে সবাই খুব অহঙ্কারী মেয়ে বলে, অবশ্য ওর কলেজের বন্ধুরা বাদে, তারা অন্য কথা বলে।'

'কি কথা?' সুমিতের মজা লাগছিলো।

শরীর আর মন, এই দুটোর চেহারা পরস্পরের ওপর নির্ভর করে না। ছেড়ে দিন এসব। একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি' কথা ঘুরালো ঝুমা। কিছু বললো না সুমিত। ঝুমা কিসের ইঙ্গিত করছে? অর্থাৎ রেণুর শরীর দেখে ওর মনের বিচার করা ভুল—এটাই কি ও বলতে চাইছে। মনে মনে বিরক্ত হলো ও ঝুমার ওপর। অকারণে অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে কেউ কেউ সুখ পায়। অথচ আজ যে কর্মটি ও অশোকের সঙ্গে করে এসেছে তার জন্য কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ ওর ব্যবহারে নেই। বলতে গেলে ঢাক পিটিয়েই ওরা জিনিসটা করলো। যেন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার আর তাই বলতে দ্বিধা হচ্ছে না যে খুব টায়ার্ড, ঘুম পাচ্ছে। হঠাৎ এক ধরনের ঘেন্না হল সুমিতের। ঝুমা আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'কই, বললেন না তো আসবেন কিনা!'

'দেখি।'

'দেখি না. আসতেই হবে, আপনাকে অনেক খবর দেব। এই যা, আপনার হেঁদো এসে গেছে।' আফসোসের গলায় বললো ঝুমা। সুমিত দেখলো ওদের ট্যাক্সি প্রায় হেঁদো পেরিয়ে যাচ্ছে। থামিয়ে নেমে পড়লো ও, আপনি একা একা যেতে পারবেন তো!' ঝুমা সরে এলো জানালায়, 'এইটুকু তো পথ। শুনুন, মাথাটা নামান, রেণুর কাছে আমি খুব খারাপ হতে পারি, কিন্তু আমিও তো মেয়ে, মেয়ে না—বলুন?' তারপর সোজা হয়ে বললো 'আসবেন কিন্তু।'

ট্যাক্সিটা চলে যেতে সুমিত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ঝুমার এইসব ব্যবহার ওর কাছে কেমন রহস্যের মত মনে হচ্ছে।

ঝুমাকে ওই ধরনের ইঙ্গিতময় কথা বলতে ও কোনদিন শোনেনি। বিয়ের পর মেয়েদের বুদ্ধি বেড়ে যায়, কথাবার্তায় ধার আসে। আজকের ব্যাপারের পর ঝুমাও কি—হেসে ফেললো সুমিত। আরে তা না, আসলে মেয়েরা এইরকমই, ওদের শরীরের মত মনের রহস্যের কুল নিজেরাই পায় না—কোথায় যেন পড়েছিলো সুমিত। ভাগ্যিস পায় না।

নটার মধ্যে মেস থেকে বেরিয়ে পড়ে সুমিত, এই সময় ট্রাম ফাঁকা থাকে, আরাম করে অফিসে যাওয়া যায়। আজ খুব মোটা আর বড় তালা ঘরে দিয়ে এলো ও। চাকরটাকে ডেকে বললো নজর রাখতে। মেসের কয়েকজন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল কিছু খোয়া গিয়েছে কিনা, ও তেমন কিছু নয় বলে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছিল একটা—যদি আবার কেউ এসে পড়ে আর চিঠিটা যদি সে পেয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে কোন কারণে চিঠির মূল্য কারো কারো কাছে বেড়ে গেছে। কারণটা জানবার জন্য কৌতুহল হচ্ছিল ওর। কালকের লোকটা যা বলে গেল তাই কি সব? রেণুর সঙ্গে কতকাল দেখা হয়নি, কতকাল। বিয়ের পর একবার এসেছিল ও, তখনই জোর করে অফিসের ফোন নাম্বার নিয়ে গেছে। রেণুই কি তাকে ফোন করেছিল। চিঠিটা সঙ্গে নেবার কথা ভাবলো একবার, কিন্তু সেটা নিরাপদ নয়।

ট্রাম রাস্তার দিকে এগোতেই ও দেখলো কালকের লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। রাগে গা রি রি করে উঠলো সুমিতের। ওকে লক্ষ্যই করেনি এমন ভঙ্গীতে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলো ও। লোকটা সামনাসামনি হতেই হাত জোর করে নমস্কার করলো, 'কালকে আপনাকে আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি স্যার, আমার নাম ব্রজবিলাস গুপ্ত।'

যেন কালকে রাত্রে ওর মনে পড়ছে নাম বলা হয়নি তাই আজ আসা এইরকম ভাব আর কি! দাঁতে দাঁত চেপে সুমিত বললো, 'কি চান?'

'কেন রাগ করছেন স্যার, চিঠিগুলো—।' লোকটা হাসতে যাচ্ছিলো, সুমিতকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ বন্ধ করলো।

'আপনাকে শেষ বার বলে দিচ্ছি আমাকে বিরক্ত করবেন না। সুমিত বেশ জোরেই কথাগুলো বললো।

'আপনি যদি অপছন্দ করেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে রেণু দেবী আপনার উপর দেখলাম ভীষণ খাপ্পা। কাল রাত্রে ওঁর বাবা এসে ওকে নিয়ে গেছেন কদিনের জন্য।' সুমিত লক্ষ্য করলো আগের কথার সঙ্গে পরের কথার মিল নেই। ও দ্রুত পা চালালো। ডালহৌসির একটা ট্রাম আসছে। ব্রজবিলাস পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে বললো, 'আমি স্যার অফিস ছুটির পর দাঁড়িয়ে থাকবো, আপনি চিন্তা কবে নেবেন।"

ট্রামে উঠে বসার জায়গা পেলো ও। ব্রজবিলাসকে রেণুর স্বামী রোজ পাঠাচ্ছে। তাহলে কাল যারা এসেছিল তারা কে। তারা নিশ্চয়ই আরো সাহসী, ঘর তছনছ করতে ভয় পায়নি। বেণুর স্বামী কি ওদেরও পাঠিয়েছিল? ভদ্রলোককে কোনদিন দ্যাখেনি সুমিত। খুব বড়সড় চাকরি কবেন এইটুকু শুনেছে ও। বয়সে ওদের চেয়ে বেশ বড়। য়ুনিভারসিটির সামনে দিয়ে ট্রামে যেতে যেতে সুমিত দেখলো দুটি ছেলেমেয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাত ধরে। রেণুকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো ওর, ভীষণ।

অফিস থেকে বেরিয়েই কিছুই করার থাকে না। মাঝে মাঝে জুলজিকাল সার্ভে অফিস যায় ও, সেখানে কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে, রামিটামি খেলা হয়। অশোক এতদিন বাইরে ছিল, এখন কোলকাতায় এসেছে ট্রান্সফার নিয়ে জুলজিকাল সার্ভেতে। ওর মাধ্যমেই ওখানে চেনাশোনা। অফ্রিস ছাড়ার সময় ও ভেবেছিল ওখানেই যাবে। রায় সাহেব, অশোকদের রায় সাহেব, অফিসের পাশেই থাকেন। তার ফ্ল্যাটেই খেলা হয়।

আজ সারাটা দিন কান খাড়া রেখেছিল ও। না, কোন ফোন আসেনি। ও খুব আশা করেছিলো যে শনিবার ওকে ফোন

করেছিল সে আজও করবে। মেয়েরা এই রকম বোধ হয়, কাউকে অস্বস্তিতে রেখে দিতে ভালবাসে। অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম লাইন ধরে হাঁটছিলো সুমিত। রাজভবনের পাশ দিয়ে ফাঁকায় হেঁটে রায় সাহেবের ফ্ল্যাটে যেতে বেশি সময় লাগে না। দু-একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ও দেখেছে ব্রজবিলাস এসেছে কিনা। শালাকে আজ ভাল করে সমঝে দিতে হবে। রাজভবনের এদিকটা ফাঁকা। আনমনে হাঁটছিলো সুমিত হঠাৎ চোখ তুলে দেখলো সামনে দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই ওর কেমন অস্বস্তি হল। ছেলে দুটো কোমরে হাত রেখে ওকে দেখছে। চোখের দৃষ্টি ভাল নয়, চোয়াল শক্ত ভাঙা গাল মুখটাকে কর্কশ করে তুলেছে দুজনেরই। ও দেখলো পেছনে আরো কয়েকজন এসে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আচমকা একটা ভয় ওর বুকের মধ্যে পাক খেয়ে গেলো। এদিকটা একদম ফাঁকা, শুধু আকাশবাণীর সামনে দিয়ে গাড়ির স্রোত যাচ্ছে। ক্রমশ বৃত্তটা ছোট হয়ে এলো। দু একজন যারা এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলো তারা ব্যাপারটা না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছে। সুমিত অসহায়ের মত তাকাল। এই মুখগুলো ওর অচেনা আর দেখলেই বোঝা যায় দয়া মায়া প্রভৃতি শব্দের কথা এরা কোনকালেই শোনেনি। ঠিক মুখোমুখি যে দাঁড়িয়েছিলো সুমিত তার দিকে চেয়ে কোনরকম বললো, 'কি চাই আপনাদের ?'

যেন এইরকম কথার জন্য ওরা অপেক্ষা করছিলো। পলকে সুমিত দেখলো ছেলেটি পেছনে শরীর বেঁকিয়ে ওর মুখের দিকে ঘুষি মারছে। ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতে সুমিত মাথাটা সামান্য সরাতে পারলো আর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাতে ও টলে উঠলো। ঠিক সেই সময় একটা হাত ওর জামার কলার চেপে ধরে ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিতেই ওর মনে হলো ওর কোমর ভেঙে গেছে। পর পর কয়েকটা লাথি এসে পড়লো কোমরে। সুমিত চিৎকার করে বললো, 'কি করছেন কি আপনারা—আপনাদের আমি চিনি না—।' যে ছেলেটা প্রথম ঘুঁষি মেরেছিলো সে এবার সুমিতের

বুকের জামা খিমচে ধরে মুখ কাছে নিয়ে এলো, 'চেনা না, শালা বদমাস, ব্লাকমেইল করার ধান্দা, তোমাকে শালা আজ জ্যান্ত পুঁতবো।' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুমিত চোখে অন্ধকার দেখলো। ছেলেটি ওর কপালের ওপর এবারে ঘুঁষি মারতে পেরেছে। যেহেতু ওর জামা ছেলেটির হাতে ধরা ছিল ও পড়ে গেলো না। ব্ল্যাকমেইল, ব্ল্যাকমেইল—সুমিত মনেমনে শব্দটা নিয়ে হাতড়াচ্ছিলো। 'চিঠিটা কেন দিয়েছ? টাকার জন্য? শালা আজ তোমাকে বাপেব বাসি বিয়ে দেখাবো।" ছেলেটা আবার হাত তুলতেই সুমিত মাটিতে পড়ে গেলো। ওর চারপাশে গাছপালার মত কতগুলো পা যার ফাঁক দিয়ে দূরে দাঁড়ানো সুভাষচন্দ্রকে দেখতে পাওয়া গেলো। হঠাৎ একটা ঘোরের মধ্যে সুমিত শুনলো, 'এই গুপী, হয়েছে আব নয়, তোমাদের আমি এভাবে ট্যাক্‌ল করতে বলিনি, ছেড়ে দাও।'

'না দীপঙ্কদা, এ শালাকে ভাল করে বানাতে দিন। আপনার বোনেব ইজ্জত মানে আমাদের ইজ্জত।' গুপীর গলা শুনলো সুমিত।

'কিন্তু মেরে কি হবে, আমার চিঠিটা চাই, ও মরে গেলে ব্যাপারটা জানা যাবে না সেটা বেহাত হয়ে গেছে কি না। ছেড়ে দাও।'

গলাব স্বরে এমন কিছু ছিলো, সুমিত দেখলো ওর চারপাশের পায়ের সারিগুলো আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে গেল। হঠাৎ একটা মুখ ওর দিকে নিচু হয়ে এলো, ব্যাপারটা এ-ভাবে হোক আমি চাইনি, বুঝতে পারছেন বয়স কম ওদের অল্পেই উত্তেজিত হয়।'

সুমিত মাথা তুলে লোকটাকে দেখলো। ফরসা চেহারা। নাক-চোখ-মুখ সুমিত চোখ বন্ধ করেই আবার খুললো, রেণু দাঁড়িয়ে আছে—অবিকল রেণু—সেই চোখ কপাল চিবুকের আদল—না, রেণু নয়। সুমিত চোখ খুলে রাখতে পারছিলো না। 'আমি বুঝতে

পারছি এখন আপনার পক্ষে মন ঠিক করে কথা বলা সম্ভব নয়, আজ রাত্রে আপনার মেসে যাব।' হাত ধরে ওকে তুলে বসালেন ভদ্রলোক, 'ক্ষমা চাইছি ব্যাপারটার জন্য।'

'দীপকদা, কুইক।' সুমিত কতকগুলো পায়ের দ্রুত চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলো। ফুটপাথে বসে মাথা দুহাতে চেপে ধরে ও চোখ খুললো, একটা কালো ভ্যান আকাশবাণীর দিক থেকে এসে ময়দানের দিকে চলে গেলো। সুমিতের মাথা ঘুরছিলো। এখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আলো জ্বলছে ময়দানে। কয়েকজন পথচারী ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নিজেদেব মধ্যে ফিসফিস করছিলো। সুমিত উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। কোমবের কাছে অসহ্য যন্ত্রণা, ঠোঁটের ওপর চটচটে গরম কি একটা লাগতেই ও জিভ বোলালো। নোনতা নোনতা স্বাদ। বাঁ চোখটা দ্রুত ফুলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা গাড়ি বেশ দ্রুত এসে প্রায় ফুটপাথে ঘেঁসে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেলো। সুমিত দেখলো কেউ লাফিয়ে নামছে। আবার ওরা এলো নাকি! দুটো হাত ওর কাঁধের ওপর আলতো করে রেখে ওকে তুলে ধরার চেষ্টা করলো, 'স্যার, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন, আমি ট্যাক্সি এনেছি।' এরকম অবাক সুমিত জীবনে কখনো হয়নি। এক চোখে কোন রকমে ও দেখলো ব্রজবিলাসের মুখ কেমন দুঃখী দুঃখী। নাকি শালা গোঁফের নীচে হাসছে! ঠিক বোঝা গেলো না। কিন্তু এ শালা কোত্থেকে এলো! দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে ব্রজবিলাস ট্যাক্সীর দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো। ওর মাথা সুমিতের বুকের কাছে। সুমিত কোন রকমে ট্যাক্সীতে উঠে মাথা হেলিয়ে দিলো পিছনের সিটে। শব্দ করে দরজা বন্ধ করে ব্রজবিলাস বললো, 'হেঁদুয়া চলিয়ে সর্দারজী।'

মাথায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে। সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা সুমিত ঘাড় ঘোরালো। প্রথম এই অবস্থায় মেসে গেলে সবাই প্রশ্ন করতে পারে। অবশ্য আজ অফিসের দিন, মেস এখনো খালি। কিন্তু তার আগে একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। ও দেখলো

ব্রজবিলাসের মুখ ওর দিকে ঝুঁকে এসেছে, 'ব্যাটারা একটুও বাদ রাখেনি, মুখটাকে কি করে দিয়েছে, ইস্।'

সুমিত কোনরকমে পকেট থেকে রুমাল বের করতেই ব্রজবিলাস খপ করে ওর হাত থেকে সেটাকে নিয়ে নিলো, 'রক্ত, কত দুধের ফোঁটায় এক রত্তি রক্ত হয়---রক্তখাকী মেয়ে—ঠিক করেছেন স্যার, বাধা দিলে ওরা মেরে ফেলতে পারতো।' আলতো করে রুমাল বুলিয়ে ওর মুখের রক্ত পরিষ্কার করে দিচ্ছিলো ব্রজবিলাস, ব্যাটা নিশ্চয়ই বক্সার, কেমন লো কাট একটা ঝাড়ল—ছবির মত দেখলাম।

মুখ সরিয়ে নিলো সুমিত, 'আপনি চুপ করুন তো।'

'না স্যার, এখন কথা বলবেন না। ওরা হল শত্রুপক্ষ, আপনার এবং আমার। ট্যাক্টিফুলি সব করতে হবে এখন। আমি বলি কি আপনি আমার সঙ্গে কোপারেশন করুন, শালারা তাহলে পারবে না। আর ঐ যে লোকটা প্রথমে লেলিয়ে দিয়ে পরে রাস ধরল, ঐ হল রেণুদেবীর দাদা—এক নম্বরের মতলববাজ। আধমরা করে তবে পিরীত দেখাতে এসেছে, একদম বিশ্বাস করবেন না। যাবার আগে কি বলে গেল স্যার?' চটচটে রুমালটা সুমিতের দিকে এগিয়ে দিলো ব্রজবিলাস। বাঁ হাতে সেটাকে নিয়ে সুমিত দেখলো এটা আর ব্যবহার করা চলে না। হাত বাড়িয়ে বাইরে ফেলে দিতেই হাঁ হাঁ করে উঠলো ব্রজবিলাস, 'আ হা হা—ফেলে দিলেন, দশ পয়সার সাবান ঘষলেই পরিষ্কার হয়ে যেত—নগদ দুটো টাকা রাস্তায় ফেলে দিলেন। বুঝতে পেরেছি, খুব শক্ পেয়েছেন—যা হারামজাদা মেয়েছেলে। তুই কিনা এককালে যার সঙ্গে রঙ করতিস তাকেই মার খাওয়ালি! ছি ছি ছি।'

সোজা হয়ে বসলো সুমিত, 'কি চাই আপনার?'

সুমিতের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর বদলে গেলো ব্রজবিলাসের, 'স্যার ঐ চিঠি যতক্ষণ আপনার কাছে আছে ওরা ছেড়ে দেবো না। আপনি বরং আমাকে দিয়ে দিন, কাজ হয়ে গেলেই ফেরৎ পাবেন। আর নগদ টাকা—।'

শরীরে একটু শক্তি ফিরে আসছিলো, সুমিত ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললো। হ্যারিসন রোডের কাছে ড্রাইভার গাড়ি থামাতেই ও হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিলো, 'নেমে যান।'

ভীষণ রকম অবাক হয়ে ব্রজবিলাস বললো, 'স্যার!'

ধমকে উঠলো সুমিত, 'নেমে যান—গেট আউট।'

'যাচ্ছি স্যার—ট্যাক্সীটা আমিই—স্যার আপনাকে মেসে পৌঁছে—আচ্ছা আচ্ছা—।, সুমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে সুড়ুৎ করে নেমে গেলো ব্রজবিলাস। দরজা বন্ধ করে ও ড্রাইভারকে চলতে বললো। গাড়িটা এগোতে শুরু করতেই ব্রজবিলাস দৌড়ে এলো পাশে, 'স্যার, একটু চিন্তা করে নেবেন, আমি আবার আসবো—স্যার!'

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকলো সুমিত, বড কষ্ট হচ্ছে, ভীষণ কষ্ট।

ভাগ্যিস রাত হয়ে গিয়েছিলো এবং ওদের মেসের কড়িডোরের আলোর বদনাম আছে, সুমিত ডাক্তারের চেম্বার ফেরৎ সোজা নিজের ঘরে চলে এলো, কেউ ওকে তেমন লক্ষ্য করেনি। বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে যে ডাক্তারখানায় এক ভদ্রলোক চুপচাপ বসে থাকতে দেখতো ও, আজ জানলো তিনিই ডাক্তার যদিও তাঁর পসারপাতি তেমন নেই, তবু তার রসিকতা করার প্রবণতা আছে। দেখা হতেই ভদ্রলোক বললেন, 'প্রেম-ট্রেম করতে গিয়েছিলেন নাকি মশাই।'

এখন ওর মুখে দুটো ছোট জোড়াতালি, গোটা আটেক ট্যাবলেট গিলতে হবে ব্যাথাগুলো মারতে আর কালকের দিনটা বিশ্রাম, অবশ্য জ্বর-ফর এসে গেলে কথাই নেই, বিশ্রাম বেড়ে যাবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ও ব্যাপারটা ভাল করে ভাবলো। মনে হচ্ছে অনেক দূরে এগিয়েছে। রেণু আর ওর স্বামী, মিঃ মুখার্জী, কি যেন নাম, বরেন মুখার্জী। হ্যাঁ এরকমই তো বলেছিলো রেণু—'বুঝলো অনেক দূর এগোবে।' কিন্তু এর মধ্যে সুমিতকে জড়াবার কোন

দরকার ছিল না রেণুর। আজ পর্যন্ত রেণুর কোন ক্ষতি হোক আমি চাইনি—সুমিত মনে মনে বললো, ঐ যে ছেলেটা যে ওকে মোক্ষম ঘুঁষিটা ঝাড়লো, গুপি, মুখ খিঁচিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেইলার বলে গালাগালি দিয়ে উঠলো কেন? তবে কি রেণু ভাবছে ওর চিঠি এতদিন ধরে আমি রেখে দিয়েছি ওর স্বামীর হাতে তুলে দেব বলে। ক্ষিপ্ত ছেলেগুলোকে এভাবে উত্তেজিত না করলে ওদের মুখের চেহারা ঐ রকম হয়! ব্রজবিলাস বলেছে রেণু এখন বাপের বাড়ি গিয়েছে।

চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল সুমিত, হঠাৎ ভেজানো দরজায় শব্দ হলো। কোনরকমে উঠে বসতেই ও দেখলো ওদের চাকর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে, 'এক বাবু এসেছেন।' কথাটা বলতে বলতে ওর চোখ সুমিতের মুখের ওপর আসতেই গোল গোল হয়ে গেলো। কিছু বলতে যাচ্ছিলো বোধহয় কিন্তু সুমিত গম্ভীর হয়ে বললো, ভেতরে নিয়ে এসো।'

সুমিত দেখলো দীপকবাবু, হ্যাঁ একাই ঘরে ঢুকলেন। ও চাকরকে চলে যেতে বলে দীপকবাবুর দিকে তাকাল, ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের মধ্যে, মুখের মধ্যে অপরাধী অপরাধী ভাব। ঘরে ঢুকেই দুহাত জোড় করলেন, 'আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই, কিন্তু বিশ্বাস করুন সব কিছু আমার ইচ্ছে মতন হয়নি।'

সুমিত উত্তর দিলো না। ও ইচ্ছে করলে লোকটাকে তাড়িয়ে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে মেসের সবাইকে ডেকে বলতে পারে, এই লোকটার সঙ্গীরা ওকে মেরেছে। কিন্তু তাহলে কিছুই জানা যাবে না, ওর রেণুর কথা শুনতে খুব ইচ্ছে করছিলো, রেণু কেন এমন করলো, কেন? সুমিত বললো 'বসুন।'

'ডাক্তার কি বলল?' একটা চেয়ার টেনে দীপক বসলেন।

'সেরে যাবে।' সুমিত দেখলো কথাটা শুনে মুখ নিচু করলেন উনি। তারপর পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলেন। সুমিত ঘাড় নাড়তেই নিজে একটা

ধরালেন, 'আমার নাম দীপক, দীপক রায়। আমি রেণুর দাদা।'

'বুঝতে পেরেছি, আপনাদের মুখের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।' সুমিত বললো।

'আমি কেন এসেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সত্যি কথা বলতে কি এ ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। বরেনের প্রভাব প্রতিপত্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী, ও চাইছে রেণুকে এমনভাবে বঞ্চিত করতে যাতে ওর কোন দায়িত্ব থাকবে না। রেণ আমার বোন, এটা আমি কি করে মেনে নিতে পারি বলুন ?' দীপক মুখ তুলে সুমিতের ছবির দিকে তাকালেন।

'আপনার বোনের সব ব্যাপার যখন আপনি—' সুমিতকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, 'আমি জানি আপনি কি বলবেন। আসলে কি জানেন আমাদের বাড়িটা ছিল খুব রক্ষণশীল। বাবা মায়ের থেকে আমাদের দুই ভাইবোন অনেক দূর মানসিকতায় মানুষ। ও আমার চেয়ে অনেক বয়সে ছোট, কিন্তু ওর একমাত্র বন্ধু আমি। ও যখন ছেলেদের সঙ্গে মিশতো তখন আমিই বলেছিলাম ভাল করে নিজেকে বোঝ তারপর যা ইচ্ছে কর আমি তোকে হেলপ করবো। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল—।'

'আমি কি করতে পারি ?' সুমিত জানলার দিকে তাকালো।

'আপনি রেণুর চিঠি কি করেছেন ?' দীপক সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন।

'আপনার কি মনে হয় ?'

'বরেন রেণুকে দিনের পর দিন এক একটা নতুন নাম বলে বলতো তোমার সব জেনে গেছি। সেইসব শুনে রেণ আমাকে একটা চিঠি লিখল সেটা আমি পাইনি। সেই চিঠির পরই বরেন রেণুকে টর্চার করতে আরম্ভ করল, আপনার নাম বলল, আর দু'দিন আগে বলেছে আপনি টাকা নিয়ে বরেনকে চিঠি দিয়ে দিচ্ছেন।'

'রেণু এটা বিশ্বাস করেছে ?'

'মনে হয় সেই রকম। ও নাকি এর মধ্যে আপনাকে অফিসে ফোন করেছিল, আপনি ফোন ধরেননি। ঝুমা নামে একটি মেয়ে যে আপনাদের সঙ্গে পড়ত সেও ওকে কি সব বলেছে। মেয়েদের মন—।'

সোজা হয়ে উঠে বসলো সুমিত। ঝুমা ওকে কিছু বলেছে? আশ্চর্যের বোধহয় শেষ থাকে না। ঝুমার সঙ্গে ওর কতদিন দেখা হয়নি, কতদিন! অথচ ঝুমা ওর সম্পর্কে রেণুকে কি সব বলে বসলো।

হঠাৎ দীপক সোজা হয়ে বসলেন, 'আপনি রেণুকে কথা দিয়েছিলেন যে, বিয়ের পরও পাঁচ বছর ওর জন্যে অপেক্ষা করবেন?'

সুমিত প্রথমে কোন কথা বললো না। ওর হঠাৎ সেই রেণুর কথা মনে পড়ে গেল, যে রেণু ওকে বলছিলো, 'আমাকে তুমি ঘেন্না করো, ঘেন্না করো ঘেন্না করো।'

'আপনি কখনো কাউকে ভালবেসেছিলেন দীপকবাবু!' হঠাৎ সুমিত বললো।

'বুঝতে পারলাম না—আপনি—' হকচকিয়ে যান ভদ্রলোক।

'ফাঁসীর আসামী, যে কোনদিন গীর্জায় যায়নি তাকেও আগের রাত্রে নম্র হয়ে বাইবেল শুনতে হয়, হয় না? দেখুন, রেণুর কথা আমার ইদানিং তেমন মনে পড়ত না। হঠাৎ হঠাৎ কাউকে দেখে —এসব কাউকে বোঝান যায় না। সেই রাত্রে রেণুকে আমি বলেছিলাম যে, আমি অপেক্ষা করে থাকবো, বেশ তো, আপনি ওকে বলবেন আমি অপেক্ষা করে আছি। চিঠিগুলো ওর স্বামী হাতে পেলে বিচ্ছেদ সহজে হবে। এটা ওর ভালই হবে, আমি তো অপেক্ষা করেই আছি। কিন্তু সত্যি বলুন তো ও মুক্তি চাইছে কি না?' উত্তেজনায় সুমিত হাঁপাচ্ছিলো।

দীপক কিছু বললেন না প্রথমটা তারপর উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ সুমিত নেমে দাঁড়ালো, 'আপনারা আমার এই ব্যবস্থা করেছেন রেণু জানে?'

মাথা দোলালো দীপক, 'আমি ওকে বলেছি, আমি অনুতপ্ত সুমিতবাবু।'

'রেণু শুনে কি বলল?' সুমিতের গলা কাঁপছে।

হাতটা নাড়লেন উনি, 'ছেড়ে দিন আমি আমার বোনকে আজও বুঝতে পারিনি সুমিতবাবু। তবে ওকে বিপদে ফেলবেন না, এই অনুরোধ।' মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ওদের কাঠের সিঁড়িতে ভদ্রলোকের পায়ের শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলো।

সাতদিন রেণুর কোন খবর ছিল না। অদ্ভুত অস্বস্তির মধ্যে সুমিত রোজ ক্লাশে গিয়েছে, রেণু নেই। অশোক হেসে বলেছে, 'তুই ভীষণ বোক, আসছে না তো কি হয়েছে। ছাখ বিয়ে টিয়ে হয়ে গেল কিনা! বিয়ে? মাথায় বেনারসীর ঘোমটা দিয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসে আছে—এ দৃশ্য চোখের ওপর হঠাৎ হঠাৎ দেখত সুমিত। আর বুকের মধ্যে এক লক্ষ দমকল ছুটোছুটি শুরু করে দিত। শেষপর্যন্ত অশোকই খবর আনলো রেণু জামসেদপুর গিয়েছে। ওর কে এক আত্মীয় থাকে সেখানে। সুমিতের ইচ্ছে হচ্ছিলো ও সোজা জামসেদপুর চলে যায়, আহা ঠিকানাটা যদি জানতো!

সাতদিন পর এক রবিবারে হোস্টেলে চুপচাপ শুয়েছিল ও। বাইরে শীত এসে যাওয়া রোদ্দুর। সিনিয়র ছেলে বলে ও আলাদা ঘর পেয়েছে। আর কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা। ওদের দারোয়ান পাত্থর এসে দরজা ধাক্কা দিলে, 'এ সুমিতবাবু, দরজা খুলিয়ে।'

তুপুরবেলায় ও আসে মণিঅর্ডারের ফর্ম লেখাতে প্রত্যেক মাসে। ভীষণ বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতেই থতমত হয়ে গিয়েছিলো সুমিত। পাত্থরের পেছনে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে একহাতে পুজোর প্রসাদের চ্যাঙারী নিয়ে রেণু দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে হাসলো। আর সুমিত অবাক হয়ে দেখলো হতচ্ছাড়া পাত্থর ওর বিরাট বপু তুলিয়ে বলছে, মায়ি পূজা করলবা।' প্রথম কথা, ওদের হোস্টেলে কোন মেয়ের ঢোকা বারণ। এনিয়ে সুপারের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে।

কোন গেস্টরুম নেই, আত্মীয়-স্বজন এলে অসুবিধে হয়। শেষ পর্যন্ত সুপার বলেছেন বয়স্কা আত্মীয়া আসতে পারেন—এটা ওদের মেনে নিতে হয়েছে। এই বয়স্কা বিচারের ভার ঐ পাথরের ওপর। মাছি গলতে দেয় না। একবার একটি ছেলের মা এসেছিলেন একা দেখা করতে। ফার্ষ্ট ইয়ারের ছেলের মায়ের বয়স বছর চল্লিশের কাছাকাছি—দেখলে আরো কম মনে হয়। ঢুকতে দেয়নি পাথব। দ্বিতীয়ত সেই পাথরের কপালে একটা সিঁদুরের টিপ। দিলটা কে! পাথব জানালো সুপার সাহেব নেই, হোস্টেলেও লোক কম। তাছাড়া এমন ভক্তিময়ী মেয়ে ও দ্যাখেনি। সুমিতবাবুব এই বোন ওকে প্রসাদ দিয়েছে। বাতচিত করে নিন, তবে আধা ঘন্টার বেশী নয়। চলে গেল পাথর।

ঘরে ঢুকেই রেণু বলেছিলো, 'এই রাগ কবেছ?'

এত অবাক হয়ে গিয়েছিলো সুমিত, হাঁ করে বেণুকে দেখছিলো। লাল পাড় সাদা শাড়ি একটি বাঙালী মেয়েকে এমন রূপসী করে তুলতে পারে আগে জানতো না ও। এখন ওর কপালে চিকচিকে ঘাম, রেণু ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো। সুমিত ভেবেছিল অনেক কিছু বলবে, অনেক অনুযোগ, অভিমানে ফেটে পড়বে কিন্তু এখন এই রেণুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও বললো, 'বলে গেলে কি হতো?'

বাঁ হাতে ওব হাত ধরলো রেণু, 'বলে গেলে যেতে পারতাম না যে। তুমি যেতে দিতে বলো?' আসলে যাওয়টা হঠাৎ ঠিক হয়ে গেলো। তোমাকে ফোনে জানাব দেখি ফোন খারাপ। তারপর রোজ কী ভীষণ খারাপ লাগতো। দুদিনের জন্য গিয়ে সাতদিন থেকে এলাম বাধ্য হয়ে। একা থাকলেই মনটা এমন লাগত যে বুঝতে পারতাম তুমি আমার কথা ভাবছ। আচ্ছা বলতো, কাল রাত ঠিক দশটার সময় তুমি কি ভাবছিলে?' ছেলেমানুষের মত মুখ করলো রেণু।

সুমিত মনে করতে চেষ্টা করলো, 'রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছিলো

রেডিওতে, শুনতে শুনতে হঠাৎ সেই ডায়মণ্ডহারবারের বুড়োটার কথা মনে পড়লো তারপরই তোমাকে—।'

'যাঃ।' চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালো রেণু, 'এম্মা আমিও এক সময় ভাবছিলাম নৌকায় বেড়ানোর কথা। বাঃ। এই চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি—অনেক দূরে। রেণুর হাত তখনও ওকে ধরা।

'তুমি আর কখনো আমাকে না বলে কোথাও যাবে না, আমার কষ্ট হয়।' সুমিত কথাটা বলতে বলতে শুনলো কারা যেন করিডোর দিয়ে আসছে। চট করে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো সুমিত, তারপর কী ভেবে হুড়কোটা তুলে দিলো, আস্তে কথা বলো, এখানকার ছেলেরা খুব জেলাস।'

'আজ সকালে ফিরেছি। ভাবলাম তোমাকে ফোন করি। তারপরে ঠিক করলাম চমকে দেব তোমাকে। স্নান খাওয়া করে কাউকে না বলে বেরিয়ে এসেছি। আসার সময় মনে পড়লো যে—তোমাদের ধর্মপ্রাণ দারোয়ান আমাকে হয়তো ভিতরে ঢুকতে দেবে না। ঠনঠনের সামনে বাসটা থামতেই একটা প্ল্যান মাথায় এসে গেলো। পূজো হচ্ছে না এখন তাই এই প্রসাদ কিনে একজনকে বলে সিঁদুর আর বেলপাতা দিয়ে মায়ের পা ছুঁইয়ে নিয়ে এলাম।'

'কেন?'

'তোমার মঙ্গল হবে তাই!' হাত বাড়িয়ে প্রসাদের চাঙারি সামনে ধরলো ও।

'কি আশ্চর্য মেয়ে তুমি।'

'আরে শোন, এই প্রসাদ দেখিয়ে তোমাদের দারোয়ানকে তো ম্যানেজ করেছি, বলো? ওকে বললাম এ ভীষণ ভারী প্রসাদ, যার উদ্দেশে পূজো তার হাতে না দিলে খুব পাপ হবে। ও বললো, আপনি এখানে দাঁড়ান আমি বাবুকে ডেকে দিচ্ছি। তখন আমি দুটো সিঁদুর লাগা সন্দেশ ওর হাতে দিয়ে কপালে টিপ পরিয়ে দিলাম। ব্যাস লোকটা কেমন ভক্তিতে গদগদ হয়ে গেলো। এই

জানো, প্রসাদ নিয়ে না হাতজোড় করে আমায় নমস্কার করলো, আমার না যা মজা লাগছিলো।' হাসতে হাসতে সুমিতের বুকের কাছে এসে দাঁড়ালো রেণু।

'আমি ও প্রসাদ চাই না।' সুমিত বললো। চকিতে মুখ তুললো রেণু। তারপর চাঙারিটা টেবিলের ওপর রেখে হঠাৎ আছড়ে পড়লো সুমিতের বুকে। সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো, সুমিত দেখলো রেণু পাগলের মত ওর কাঁধে গলায় মুখ ঘষছে। পায়ের পাতা থেকে হাতের আঙুল অবধি একটা 'কি জানি কি' বিন্দু বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সুমিত রেণুর কাঁধে হাত রাখলো। দুহাতে সুমিতকে জড়িয়ে ধরেছে ও, দাঁড়িয়ে থেকে সুমিত টলতে লাগলো। তারপর ও রেণুর মুখ দুহাতে অঞ্জলির মত করে ওপরে তুললো। বেণুর চোখে জল।

এখন এই নির্জন দুপুরে ওর হোস্টেলের এই ঘরের বন্ধ দরজা সুমিতকে তার সমস্ত ছেলেবেলা, কৈশোর থেকে টেনে এনে ছুঁড়ে দিলো যৌবনেব রহস্যময় দ্বিধা আর বিস্ময়ে। চোখে চোখ রাখলো রেণু। ভিজে চোখের পাতায় এত কথা লেখা থাকতে পারে সুমিত কখনো জানতো না। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলো সুমিত। তিল তিল কবে বুকের মধ্যে একটা বোধ ছড়িয়ে যাচ্ছে, এরই নাম কি সুখ! একটা ঘোরের মধ্যে চাপা স্বরে সুমিত বললো, 'রেণু আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'সুমিতের বুকে একটা গাল চেপে রেণ বললো, 'জানি জানি জানি।'

'তুমি?' কাঙালের মত বললো সুমিত।

'হুঁ হুঁ হুঁ।' একটু একটু করে দুলছিলো রেণু। ওর দুহাতের মধ্যে জড়িয়ে থাকা সুমিতের শরীরটায় সেই দুলুনি লাগলো। রেণুর মসৃণ মুখ, ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসির ঢেউ—সুমিত মাথা নিচু করলো। মুখ নামাল ও—চোখের সামনে একশ নন্দন কানন—রেণু চোখ বুঁজে ফেললো। রেণু কি ভয় পাচ্ছে? ওকি চাইছে

না ? সুমিত দেখলো কি একটা আশ্চর্য মায়ায় রেণুর মুখ ক্রমশ সুন্দর হয়ে উঠছে আরো। রেণুর ঠোঁটে ঠোঁট রাখছিল ও, রেণুর গরম নিশ্বাস লাগছে মুখে—আর ঠিক সেই সময় এক ঝটকায় মুখ সরিয়ে নিলো বেণু। তারপর সুমিতের কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে হুহু করে কেঁদে ফেললো ও, 'আমি খারাপ, খুব খারাপ।'

খুব নাড়া খেলে কারো সাড়া থাকে না আচমকা, সুমিত প্রথমটা কিছু বলতে পারছিলো না, তারপব এগিয়ে এসে রেণুর কাঁধে হাত রাখলো, 'এই কি যাতা বলছ ?'

'তুমি আমাকে খুব বিশ্বাস করো, না ?' রেণু মুখ ফিরাচ্ছিলো না।

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি বেণু।'

'অথচ দ্যাখো এই সাতদিন তোমাকে কি কষ্ট দিলামআমি। তুমি তো একবাবও জিজ্ঞাসা করলে না কেন চলে গিয়েছিলাম আমি ?'

'তুমি তো বলবেই যদি তেমন কিছু জরুরি হয়।'

দুহাতে শিশুর মত জড়িয়ে ধরলো বেণু সুমিতকে। তারপর সুমিতের ঠোঁটে আলতো কবে ঠোঁট ছোয়ালো। চমকে উঠলো সুমিত—এরকম হচ্ছে কেন ? শরীবের সব রক্ত আচমকা টলে উঠলো কেন ? চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেবাব মত রেণু ওর কপালে, চোখের পাতায়, গালে, চিবুকে—এখন সারা মুখে ছোট ছোট চুমু খেয়ে যাচ্ছে শুধু নিষিদ্ধ করে রাখছে ঠোঁটটা। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে গেলো সুমিতের, বুকের বাতাস এত ভারী কেন ? শেষ পর্যন্ত তিন বছর না খাওয়া কোন ভিখারীর মত ঝাঁপিয়ে পড়লো রেণুর ঠোঁটে। দুটো নরম উষ্ণ অথচ সিক্ত জবাফুলের মত ঠোঁট পাগলেব মত নিতে চাইলো নিজের মত করে। অস্ফুট আওয়াজ করলো রেণু, 'উঃ, একেবারে রাক্ষস, লাগে না বুঝি।' একটু থমকে গেলো সুমিত, মুখ তুলে দেখলো রেণু হাসছে, 'উম্, আমাকে নাও, নাও, নাও।'

একটা ঝড়ো বাতাসের মত সুমিত রেণুকে বুকে তুলে নিলো। ওর অগোছালো বিছানায় রেণুকে শুইয়ে দিল যত্ন করে। ছেলে-

মানুষের মত রেণু ওকে দেখছিল। খাটের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে সুমিত রেণুর হাতে মুখ রাখলো। কি নরম জলের মত গন্ধ রেণুর হাতে, সমস্ত ছেলেবেলা মনে করিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে মুখ নামালো ও হাতের ওপরের দিকে, বাজুতে। রেণুর বুকের কাছে মুখ-রেখে ও কৃপণের মত চুপ করে বসে থাকল খানিক। আজ অবধি কোন যুবতী মেয়ের বুক দ্যাখেনি ও—রেণুর বুক কি রকম?

একটা হাত সুমিতের মাথায় রেখেছে রেণু, আঙ্গুলগুলো ওর চুলের ভিতরে খেলা করছে। রেণুর বুকের মধ্যে থেকে মন কেমন করা সুবাস উঠে আসছে ওর নাকে। এই জামা এবং অন্তর্বাসের আড়াল খুললেই রেণুর সমস্ত যৌবনটা ওর সামনে এসে দাঁড়াবে—অথচ ওর খুলতে কেমন ভয় হচ্ছিলো। একবার আড়াল ঘুচে গেলেই সব যে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। পবিষ্কার যা তাকি সাদামাটা নয়? ও আস্তে আস্তে মুখ নামালো নিচে, রেণুর কোমর পেট কী নরম—আঃ।

রেণু চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, এখন ওর ঠোঁটদুটো ঈষৎ খোলা। চিকচিকে কুন্দ ফুলের মত সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। জিভের ডগা দাঁতের গায়ে সামান্য নড়ছে, 'এই, শোনো।' রেণু ডাকলো।

মুখ তুললো সুমিত। রেণুর গলার স্বর কেমন ভারী।

'এখানে এসো, আমার পাশে এসে শোও।' হাত বাড়িয়ে ডাকলো রেণু। মুহূর্তে পরিবেশটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে টের পেলো সুমিত। এই রেণু একটু আগের রেণু নয়। অনেক ভিতরের থেকে কথা বলছে ও যা সুমিতের বুকের মধ্যে একটা শিরশিরে ভয় ছড়িয়ে দিলো। উঠে এসে রেণুর পাশে শুয়ে পড়লো ও। সরে এলো রেণু, তারপর সুমিতের বুকে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে আনমনে কি লিখতে লাগলো। চোখ বন্ধ করে সুমিত লেখাটা বোঝার চেষ্টা করছিলো।

'এই আমাকে বিয়ে করবে? আজ কিংবা কাল।' খুব আস্তে আস্তে রেণু বললো।

'রেণু!' সুমিত অবাক হয়ে গেলো।

'আমার ভীষণ ভয় সু, ভীষণ ভয়।'

'কেন, কিসের ভয়, তুমি তো পরীক্ষা দেবে, দেবে না?'

'পরীক্ষা?' হাসলে রেণু, 'বাবা ভীষণ ফিউরিয়াস, আর রাস ঢিলে রাখতে চাইছেন না। জামসেদপুর গিয়ে দেখলাম প্রস্তুতিপর্ব পুরোদমে চলছে। ওখানে যাকে দেখলাম সেও শক্ত ধাঁচের মানুষ বলে মনে হল। এখানে আমি রাজী হবো না বলে জামসেদপুরে নিয়ে গিয়ে আমাকে দেখানো হলো। ভদ্রলোক কি বললেন, জানো, য়ুনিভার্সিটিতে সবারই কিছু না কিছু কাফ্‌লাভ থাকে, আমি কিছু মনে করি না তাতে।'

উঠে বসলো সুমিত, 'তুমি বলছ জামসেদপুরে তোমাকে বিয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল'!

মাথা নাড়লো রেণু, 'হুঁ। লোকটা চাকরী করে কোলকাতায়, খুব বড় অফিসার। আমার দিকে এমন করে তাকালো যেন আমি খুব বাচ্চা মেয়ে।'

'তুমি কেন দেখা করতে রাজী হলে?' সামনে একটা অন্ধকারের ভারী পর্দা, সুমিত দুহাতে তাকে সরিয়ে দিচ্ছিলো।

'আমি বুঝতে পারিনি, এমন কি দাদাও আমাকে বলেনি।'

'আমি তোমার বাড়িতে যাব, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবো।' সোজাসুজি বললো সুমিত। রেণু হাসলো, 'বাবাকে তুমি চেনো না। তুমিই বরং যা করার করে ফেলো। আমি আর পারছি না, যা করবে আমি তাতেই রাজী।'

'কিন্তু আমার তো একটু সময় দরকার।' অন্ধের মত হাতড়ালো ও, 'একটা চাকরী না হলে, তুমি তো সবই জানো—আমি এখনই বিয়ে করতে চাই, কিন্তু বিয়ে করে তোমাকে রাখবো কোথায়?'

'আমি জানি না, কিছু জানি না, এসব তুমি ভাববে, আমি আমার সবকিছু তোমাকে দিয়ে দিলাম।' ছেলেমানুষের মত সুমিতের বুকে মুখ ঘষলো রেণু।

'এত ভার দিচ্ছ, আমি তোমার কে ?' হাসতে চেষ্টা করলো সুমিত। ফিস ফিস করে, গভীর নিশ্বাসে রেণ বললো, 'পতি দেবতা গো।'

একমাত্র অশোক, যাকে সব বলা যায়, সুমিত বললো। চুপচাপ শুনে গিয়ে অশোক বললো, কুছ পরোয়া নেই, তোর যদি মনে হয় রেণুকে না পেলে তুই মরে যাবি, এক কাজ কর, রেজিষ্ট্রী করে ফেল, আমি সাক্ষী দেব।'

'তারপর ?' সুমিত প্রশ্ন করলো।

'তারপর আর কি! ও পরীক্ষা দেবে, তুইও। আর ওর বাপশালা যদি নাছোড়বান্দা হয় বিয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে দেবে। আর যা হোক বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবে না তো।' অশোক সিগারেট ধরালো।

'যদি দেয়।'

'তোদের মাইরি শুধু যদির ধান্দা। এই যে আমি আর ঝুমা কমসে কম্' বলে হেসে ফেললো, 'নাইবা শুনলি সংখ্যাটা আমরা একবারও বলিনি যদি কিছু হয়। হলে হবে, দেখা যাবে। আমরা চাঁদা তুলবো তোর নামে, রিলিফ ফাণ্ড।'

বিরক্ত হলো সুমিত, 'এইসব, সিরিয়স ব্যাপারে ঠাট্টা ভালো লাগে না অশোক। তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না—।'

'চা বাগানে কাজ করবি ?' হঠাৎ বলে বসলো অশোক।

'কি কাজ ?'

'কেরাণীর। কোয়ার্টার পাবি আরো কি কি সব।'

'কোরবো।

'গুড। প্রেমের জন্য কি স্যাক্রিফাইস। বেশ, চলে যা ঝুমার বাড়ি। ওর মামার দুটো চা বাগান আছে ডুয়ার্সে। ঝুমা ধরলে হয়ে যাবে।'

'সিরিয়াসলি বলছিস!' কল্পনায় সবকিছু দেখতে পেল সুমিত।

'হ্যাঁ ভাই। তোর অবশ্য পরীক্ষা দিলে লাভ হতো। তা আর কি হবে। এই আমিই তো পরীক্ষা দেব না।'

'সে কি, কেন ?

'তোকে বলিনি, জুলজিকাল সার্ভেতে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। কাল অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার পেয়েছি—হায়দ্রাবাদে পোস্টিং। কেটে পড়ছি। এম এ পাশ করে তো আর একটা হাত গজাবে না।'

বাঃ দারুণ খবর। এতক্ষণ চেপে রেখেছিলি কি বলে।' খুব খুশী হলো সুমিত, 'তা বিয়ে করে যাচ্ছিস নাকি।'

'ধ্যুৎ, আমি বলে পালাচ্ছি একঘেঁয়েমি থেকে বাঁচতে।'

'একটা মেয়ের সব জানা হয়ে গেলে কদ্দিন টিঁকে থাকা যায় বল। আর সেটা ঝুমারও মনে হতে পারে। দুজনেই রিলিফ পাবো। ছেড়ে দে তুই বরং চলে যা ঝুমার বাড়ি, আমি পুরুত-মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক করে ফেলি তোর। কি বলিস ?'

কোন কথা বলতে পারেনি সুমিত। কি সহজে অশোক এসব কথা বলে গেলো। এতদিনের একটা সম্পর্ক বাঁ হাত নেড়ে অবহেলায় যেন সরিয়ে দিলো। ওর মনে পড়লো ডায়মণ্ডহারবারের সেই হোটেলটার কথা। প্রয়োজন কত সহজে মিটে যায় কারো কারো। রেণুর ব্যাপারে এরকমটা ও ভাবতে পারে না, ভাবতে গেলেই রক্ত হিম হয়। কেন ?

তখন একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে সুমিতের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিলো। চোখ বন্ধ করলেই রেণু সামনে এসে দাঁড়ায় আর বুকের মধ্যে একটা ভয় অক্টোপাশের মত সেই রেণুকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সেই মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছিলো কী অসহায় হয়ে মানুষেরা বেঁচে থাকে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ও ভেবেছে রেণুকে নিয়ে কোথাও যদি চলে যাওয়া যায়। রেণু ওর থাকবে না, বুকের আড়ালে বসে রেণু চিরকাল থাকবে না—কি অসহ্য কষ্ট ঘুর্ণির মত পাক খেয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে উঠল ও। ঝুমার কাছে যাবে কি যাবে না ভাবছিলো, অশোকই এসে হাজির হল মেসে, 'দিন ফিন

ঠিক করে ফেলেছি। আজ হলো শুক্রবার, সোমবার দুপুর বারোটায়। এই নে কার্ড। রেণুকে আসতে বলবি ঠিক সময়।'

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো সুমিত, বলছেটা কি? ও শুনেছিলো অন্তত একমাসের নোটিশ দিতে হয়, আরো কি সব ফর্মালিটি আছে, অথচ অশোক দুম করে দিন ঠিক করে এলো।

এক চোখ ছোট করে অশোক হাসলো, 'আমার ওপর তোর দেখছি আস্থা ফাস্থা কমে গেছে। ম্যারেজ রেজিস্টার আমার চেনা-শুনা এটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। আর হ্যাঁ, তুইতো ঝুমার কাছে যাসনি। কি ব্যাপার ভ্যানিটিতে লাগছে?'

সুমিত বললো, 'ভাবছি।'

হতাশ হবার ভান করলো অশোক, 'থাক আর ভাবতে হবে না, ঝুমার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। ও অবশ্য একটু আধটু গাঁই-গুঁই করার ধান্ধায় ছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছে। ওর মামার আবার মেয়েদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে। ঝুমার কথা ফেলতে পারবে না। দিন দশেক পরেই ভদ্রলোক কোলকাতা আসছে। সেন্টপার্সেন্ট সিওর হয়ে থাক।'

সেইদিন দুপুরে বসন্ত কেবিনের বারান্দায় বসে সুমিত রেণুকে বললো, 'সোমবারে তুমি য়ুনিভার্সিটি আসছ?'

ইদানিং কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে রেণু। কথা বলার আগে কী জানি কী ভাবে চোখ তুলে তাকালো, 'কেন?'

'মাঝে মাঝে তো দেখি ডুব মারছ, তাই।' সুমিত কথাটা বলবার জন্য ছটফট করছিলো।

একটু হাসবার চেষ্টা করলো রেণু, 'আসব।'

'শোন, য়ুনিভার্সিটিতে আসতে হবে না তোমাকে। ঠিক পৌনে বারোটার সময় তুমি ওয়েলিংটনের মোড়ে উষা কোম্পানীর দোকানটার সামনে আসবে, আমি থাকবো।' সুমিত বললো।

'কি ব্যাপার, আবার কোথায় যাবে।' চা দিয়ে গিয়েছিলো বয়, কাপটা টেনে নিতে নিতে বললো রেণু।

'আমি চা বাগানে চাকরী নিচ্ছি। শুনেছি ভাল কোয়ার্টার দেয়, নিরিবিলি নির্জন, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ঐ সোমবারে ওয়েলিংটনে এসো।' রেণুর চোখে চোখ রাখলো সুমিত, 'আমরা ঐ সময় বিয়ে করবো, রাজী ?'

চায়ের কাপটায় চুমুক দেবে বলে তুলেছিলো, আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলো রেণু।

সুমিত ওর দিকে তাকালো, চোখ বড় হয়ে গিয়েছে রেণুর। আস্তে আস্তে মুখটা খুশীতে ভরে গেলো। কোনরকমে বললো 'যাঃ।'

সুমিত ঘাড় নাড়লো। অনেকক্ষণ চোখ সরালো না রেণু। তারপর বললো, 'এই, তুমি সত্যি কথা বলছ, বলো।'

'তিন সত্যি কেন তিনশো সত্যি করতে পারি।' সুমিত হাসল, 'সব ঠিকঠাক, শুধু তুমি আসবে এইটুকু বাকী।'

হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা সুমিতের আঙুলের ডগাগুলো ছুঁলো রেণু, 'চা বাগান অনেক দূরে না—আঃ, তুমি কি ভালো সু, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে সু।'

হঠাৎ সুমিতের মনে হলো, আজ ওর বিরাট পাওয়াটা হয়ে গেলো। এখন আর কোন বাধা সামনে নেই আর যেগুলো বাধা বলে সে থোড়াই তোয়াক্কা করে। রেণু সঙ্গে থাকলে সে কোলকাতা জয় করে ফেলতে পারে।

'এই একটা কথা বলবো ?' রেণু অনেকক্ষণ পরে বললো।

বলো।'

'তুমি পরীক্ষা দেবে না ?'

'এবছর তো হবে না, পরে দেখা যাবে।' প্রসঙ্গটা ভাল লাগছিলো না সুমিতের।

'আমার জন্যে, শুধু আমার জন্যে না।'

'রেণু !'

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে তাকালো রেণু। এখান থেকে মেডিকেল কলেজের ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায়। রেণু বললো,

'চাকরীটা তুমি কি করে পেলে? তুমি তো কোনদিন চা-গাছ দ্যাখোনি।'

হেসে ফেললো সুমিত, 'আমি তো তোমাকেও চিরকাল দেখিনি, তবু পেলাম কি করে! না, না, শোন, অশোক ঝুমার মামার মাধ্যমে চাকরীটা জোগাড় করছে।'

'ঝুমার মামার মাধ্যমে?' চোখ তুললো রেণু।

'ভদ্রলোকের অনেক চা বাগান আছে। ঝুমা বললে ফেলতে পারবেন না।' বেশ বিশ্বাসে বললো সুমিত।

'অশোক বলেছে?'

'হ্যাঁ, ও তো সব জানে।'

'তার মানে তুমি এখনো এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটাব হাতে পাওনি। আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না সু।' ছোট ছোট কয়েকটা আঁচড় রেণুব কপালে ফুটে উঠলো।

'কিন্তু অশোক বলছে, ঝুমা কথা দিয়েছে ওকে। আর ওর মামা ঝুমার কথা ফেলতে পারবে না।' মরীয়া হয়ে বোঝালো সুমিত, 'যাদের অনেক চাবাগান আছে তাদের পক্ষে একটা চাকরী দেওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। তুমি এসব নিয়ে ভেবো না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেবো।'

'ভালো। আমার শুধু ভয় হয়। আমার কপালটাই যে এরকম সুখ একদম সতীন হয়ে আছে। ওর কথা বলার মধ্যে এমন একটা সুর ছিলো সুমিত কিছুতেই সেটাকে মেনে নিতে পারছিলো না। অথচ রেণু যখন এই ধরনের কথা বলে ওকে বাধা দিয়ে কোন লাভ হয় না। এই সময়ের রেণুকে কিছুতেই চিনতে পারে না সুমিত, এই ধরনের কথাবার্তা শুনলেই কেমন ভয় হয় ওর।

'ঝুমার কাছে তুমি গিয়েছিলে?' রেণু আবার বললো।

'না। অশোকই যোগাযোগ করছে।'

'ঝুমা আর অশোক ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে জানো?'

এই প্রশ্নটাকেই ভয় করছিলো সুমিত। এতদিন মেলামেশার

পর কত সহজে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ব্যাপারটা নিজেই বুঝতে পারে না সুমিত। আর রেণুকে ও এর কি উত্তর দেবে। ভালবাসা যদি পরস্পরকে কাছে আনার জন্য সৃষ্টি হয় তাহলে এইভাবে বিচ্ছেদ কেন শুরুতেই। এই ঘটনা কি রেণুকে প্রভাবিত করবে অন্য কোন চিন্তায় যেতে ? ও অবশ্য জোর করে বলবে সবাই অশোক বা ঝুমা নয়। কিংবা কোন ভুল ওরা আবিস্কার করে সচেতন হয়েছে। কিন্তু রেণু আবার বললো, 'ঝুমা এখন একটি অবাঙালী ছেলের সঙ্গে মটরে ঘোরে, সবাই বলছে, তুমি জানো ?'

এটা জানতো না সুমিত। তবে অশোক ছাড়াও ঝুমার অনেক ছেলে বন্ধু আছে এখবর তো খুব পুরোন। বাস্তবিক, প্রথম প্রথম ও অবাক হতো, ভাবতো অশোক এটাকে কি করে সহ্য করছে। কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে ক্রমশ মনে হয়েছিলো, এটা আসলে কোন ব্যাপারই নয়। ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিলো মানুষ ভালবাসলেই নিশ্চয়ই আনসোস্যাল হয়ে পড়বে না। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে যদি নিজস্ব বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা যায় তাতে হানিকর কিছু ঘটে না। ভালোবাসার মূলমন্ত্র যদি আণ্ডারস্ট্যানডিং হয় তবে যে কোন ব্যাপারই মানিয়ে নেওয়া চলে। মনে হয়েছিলো অশোকের তুলনায় ঝুমার প্রকাশ একটু উগ্র। তা আর কি করা যাবে, হাতের পাঁচটা আঙুল তো আর সমান হয় না। ঝুমার ক্ষেত্রে তা সমান করতে গেলে বরং অসুবিধেই হতো। একটা মানুষের পাঁচটা আঙ্গুল সমান—ভাবা যায় ! সে একটা শব্দ সচ্ছন্দে লিখতেও পারবে না।

কিন্তু এসব কথা রেণুকে বললো না সুমিত। ঝুমা আর অশোক ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখন যে ঝুমা কোন অবাঙালী ছেলের সঙ্গে মটর করে ঘুরছে এটা কি অশোককে অসম্মান করা নয় ? ছাড়াছাড়ি মানে কয়েকটা সম্পর্কের কাটান ছাড়ান ? অশোক তো এমনিতে ঝুমার সঙ্গে কথা বলে, নইলে সুমিতের পক্ষে সুপারিশ করছে কি করে ! সেদিক দিয়ে অশোক কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না বোঝা যায়।

আর ঝুমার এই নতুন মেলামেশা কি মোটা দাগ দিয়ে আণ্ডার লাইন করে দিচ্ছে অশোকের সঙ্গে মেলামেশাটা আন্তরিক ছিল না ? নাকি ঝুমা আর একবার চাইছে হৃদয়টা বাঁচিয়ে রাখতে, নিজের জন্য। অসম্মান-টসম্মান সব বাজে ব্যাপার।

সুমিত খুব ক্লান্ত চোখে তাকালো রেণুব দিকে, 'ছেড়ে দাও ওদের কথা। সব কিছু তো আমি বুঝতে পারি না।'

সোজাসুজি রেণু বললো, 'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না, বল ?'

'পাগল !' সঙ্গে সঙ্গে বললো সুমিত।

'আচ্ছা তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস ?' অনেক দূর থেকে বললো রেণু।

'কি প্রমাণ চাও ?'

'আমি যদি কোন অন্যায় কাজ করে এসে বলি, ক্ষমা করো, করবে।'

'আমি সেটাকে অন্যায় বলে ভাববোই না।'

'আমি যদি বলি পাঁচ বছর আমাব জন্য অপেক্ষা করো, আমি তোমার কাছে আসব, আসব, আসব। তুমি অপেক্ষা করবে ?'

'হ্যাঁ আমি করব। কিন্তু এসব কথা উঠছে কেন ? তুমি সোমবার দুপুরে ওখানে আসবেই। আমি আর কোন রিস্ক নিতে চাই না রেণু।'

'আমি আসবো।'

রেস্টুরেন্ট থেকে নামবার সময় রেণু হঠাৎ ফিসফিস করে বললো, 'এই তোমার হাতটা ধরতে খুব ইচ্ছে করছে গো।'

থমকে দাঁড়ালো সুমিত। এখন চারিদিকে বেশ ভীড়। লোকজন উঠছে, নামছে। কেউ কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন রেণুকে হাতটা ধরতে দিলে কেমন দেখাবে ! ধর্মতলা পাড়ায় ফিরিঙ্গী মেয়েরা কি সহজে বন্ধুদের হাত ধরে যায়। অথচ এখানে রেণুর হাত ধরতে ওর সঙ্কোচ হচ্ছে কেন ? হঠাৎ ও হাত বাড়িয়ে

রেণুর নরম হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে সোজা পায়ে চলে এলো বাইরে। একরাশ লোক সিনেমা দেখার মত বিস্ময়ে তাকিয়েছিলো ওদের দিকে। বাইরে বেরিয়ে এসে আস্তে করে হাত ছাড়িয়ে রেণু বললো, 'এই তুমি কি করলে গো?'

সুমিত বললো, 'আমি সব পারি, সব।'

ঠিক আধঘণ্টা আগে ওয়েলিংটনের মোরে এসে দাঁড়ালো সুমিত। এখন বেশ রোদ উঠে গেছে। অফিস যাবার তাগিদে এসপ্লানেড যাবার গাড়িগুলোয় প্রচণ্ড ভীড় এখন। মোড়েই বাসস্টপ। বালীগঞ্জের দিক থেকে আসা বাসগুলো কিন্তু ফাঁকা। এর যে কোন একটা বাসে রেণু এসে পড়বে। সুমিত দেখলো ঘড়িতে এখন এগারোটা বেজে কুড়ি।

কাল সারারাত প্রায় বিনিদ্র কেটেছে ওর। অদ্ভুত একটা আনন্দ মেশানো ভয়, অনিশ্চয়তায় ও ছটফট করেছে। অনেক দূরে বিহারের এক শহরে থাকা মায়ের কথা মনে হয়েছে বার বার। মা শুনলে কি বলবেন? একবার ভেবেছে মাকে সব বুঝিয়ে চিঠি লেখে। কিন্তু সাহস হয়নি ওর। শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছে, সব চুকে যাক তখন জানানো যাবে। হয়তো মা মেনে নেবেন না। কোন মা-ই নিজের সন্তানকে উপায় না থাকলে পছন্দ করে বিয়ে করতে দিতে চান না। আর ওর এম-এ পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে না শুনলে তো কোন কথাই নেই। একটা বয়স ছিলো যখন মায়ের মনে কষ্ট দেবার কথা ভাবনায় আসতো না। তেমন কিছু হলে নিজেকে কী অপরাধী মনে হতো। এখন বয়স বাড়ার সঙ্গে দূরত্বটা কতদূর বেড়ে গেছে। যৌবনে এসে গেলে প্রত্যেকের নিজের নিজের আয়না তৈরী হয়ে যায়। নিজের মুখ নিজের মত করে দেখা যায় তাতে, মায়ের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে হয় না আর। মায়েদের দুঃখ বোধহয় এইখানেই।

মিনিট দশেক আগে অশোক এসে গেলো। আর সুমিত অবাক হয়ে দেখলো, সঙ্গে ঝুমা। দারুণ সেজেছে মেয়েটা, এই

সকালে মাথায় একটা গ্লাণ্ডিফ্লোরের কুঁড়ি গুজেছে। অশোকের সঙ্গে ঝুমাকে ভাবতেই পারেনি সুমিত। ট্যাক্সী থেকে নেমে ঝুমা বললো, 'কি দেখছেন অমন করে, আজ তো অন্যলোককে দেখতে হবে, চোখ তার জন্য বন্ধ রাখুন।'

'আমি ভাবতে পারিনি—' সুমিত বলতে গিয়ে থেমে গেলো।

'ইচ্ছে করেই চলে এলাম। বিয়ে দেখতে কোন মেয়ের খারাপ লাগে বলুন। আর সাক্ষী হিসেবে সই দিতে আমার খুব সাধ। আর তার ওপরে আপনার বিয়ে বলে কথা।' বেশ জোরে জোরে বলছিলো ঝুমা। সুমিত দেখলো আশেপাশের দাঁড়ানো লোকজন ঘাড় ঘুড়িয়ে ওকে দেখছে। কেমন লজ্জা লাগলো, 'তোরা এগো, আমি অফিসটা দেখে এসেছি, রেণু এলেই নিয়ে যাব।'

'আপনার বিয়েতে কি প্রেজেন্টেশন দেব জানেন?' ঝুমা হাসলো।

অশোক বললো, 'তোর চাকরী কনর্ফার্মড। ঝুমা প্রমাণ নিয়ে এসেছে।'

সুমিত মাথা নিচু করলো, 'কি বলে আপনাকে—।'

অশোক বললো, 'গুড, গুড, বেশ ফর্মালিটি চলছে। আচ্ছা, আমরা এগোচ্ছি তুই আয়। বারোটা পাঁচ নাকি খুব শুভ সময়। পাঁজিতে আছে। রেণুর চলে আসা উচিত ছিল এতক্ষণে।' ওরা এগিয়ে গেলো রাস্তা পার হয়ে সামনের বড় বাড়িটার দিকে।

বুকের মধ্যে একটা আনন্দ টগবগিয়ে উঠেছে। যাক্, চাকরীটা তাহলে পাওয়া গেছে, মুখে না বলুক, একটু দ্বিধা ছিলো সুমিতের, যদি শেষ পর্যন্ত না হয়। এখন ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। কিন্তু রেণু এখনও আসছে না কেন? একটা টু-বি বাসকে দুলতে দুলতে আসতে দেখলো ও। কিছু লোক নামছে। না রেণু নেই। বাসটাতো ফাঁকা। রেণু ইচ্ছে করলেই চলে আসতে পারত। এর পরের বাসটা কতক্ষণে আসবে? ঘড়ি দেখলো সুমিত। ঠিক পৌনে বারোটা বাজে এখন। এত দেরী করছে কেন? ওকি খুব সাজ-

গোজ করছে ? আর একটা ডবলডেকার আসছে, না, এটা তিন নম্বর। বালীগঞ্জের বাস নয়। রেণুতো ট্যাক্সী করেও আসতে পারত। আজকের দিনে একটু বেহিসাবি হলে ক্ষতি কি !

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেলো। পায়ের তলা ঘামছে সুমিতের। বারোটা পাঁচ মিনিট শুভসময়—রেণুর যদি একটু আক্কেল হতো। এ খবরটা আগে ওকে জানিয়ে দিলে নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করতো রেণু। সময়টময় বেশ মানে ও। শিবরাত্রির সময় উপোস পর্যন্ত করে। কিন্তু এখনো আসছে না কেন ? ওর বাড়িতে ফোন নেই, থাকলে করা যেত। অবশ্য পাশের বাড়িতে আছে নম্বরটা দিতে চায়নি রেণু। যার ফোন তিনি পছন্দ করবেন না। কি যেন নাম —সুমিত মনে করতে চেষ্টা করল, রায়চৌধুরী—হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ টাইটেলই তো। একদিন রাত হচ্ছিলো বাড়ি ফিরতে। রেণু ফোন করতে গিয়েছিল এক দোকান থেকে বাড়িতে খবর দেবার জন্য। ফোনটা ভাঙা ছিল না। জোরে কথা বলতে হচ্ছিলো। ভদ্রলোক নম্বর বুঝতে পারছিলেন না, রেণু নাম জিজ্ঞাসা করেছিলো। তখন রায়চৌধুরী টাইটেলটা শুনতে পেয়েছিলো ও। রায়চৌধুরী, যেহেতু রেণুদের পাশের বাড়ি, নিশ্চয় বালীগঞ্জ স্টেশন রোড। একবার গাইড দেখে ফোন করবে নাকি ! হাতের তালু ঘামছে এবার। সুমিত দেখলো একটা দু নম্বর বাস আসছে। ভীড় আছে বাসটায়। হলুদ শাড়ির আভাস দেখে সুমিত হাসবার চেষ্টা করলো না, ভদ্রমহিলা বিবাহিতা। আড়চোখে সুমিতকে দেখে ব্যাগ থেকে গগলস্ বের করে চোখে এঁটে চলে গেলেন ওয়েলেস্লির দিকে। না রেণু এই বাসটাতেও এলো না। এখন বুকের মধ্যে একটা শীতল ভয় চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে, সুমিত অসহায়ের মত তাকালো। এখন রাস্তা ফাঁকা। কোথাও বাসট্রামের চিহ্ন নেই। যেন শেষ বাস চলে গেলো এইমাত্র, সুমিত হতাশ চোখে সামনের বাড়িটার দিকে তাকালো। অশোকরা নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছে। ওদের কি খুব তাড়া দিচ্ছে রেজিস্ট্রার ? বারোটা পাঁচ চলে গেলে আর কি শুভক্ষণ

পাওয়া যাবে না ? শুভক্ষণ-ফণ আবার কি—যখনই ইচ্ছে হবে তখনই সময় শুভ। একটু সরে দাঁড়ালো সুমিত।' রেণু, রেণু, রেণু। মনে মনে ডাকলো ও। ডাকার মত ডাকলে সব পাওয়া যায়। তবু রেণু আসছে না কেন ? তবে কি রেণু আসবে না! ওর মনে পড়লো সেদিন কথা বলার সময় রেণু কেমন অন্যমনস্ক ছিলো। রেণু ওকে অপেক্ষা করতে পারবে কি না জিজ্ঞাসা করছিলো। কেন ?

খুব দ্রুত কেউ ঢাক বাজাচ্ছে বুকের মধ্যে বসে—সুমিত মাথা নাড়লো। তাবপর সামনের দোকানে ঢুকে পড়লো ও। এখান থেকে বাসস্টপ পরিষ্কার দেখা যায়। রেণু যদি আসে ও চট করে বেরিয়ে আসতে পারবে। কাউন্টারে বসা ভদ্রলোকের কাছে ফোন করতে চাইলো ও। মাথা নাড়তে গিয়ে কি ভেবে আঙুল দিয়ে ফোনটা দেখিয়ে দিলেন উনি, 'আট আনা লাগবে।'

চট করে গাইডটা খুলে ও রায়চৌধুরী বের করলো। আঃ, কোলকাতায় কত বায়চৌধুবী আছে! এইতো রায়চৌধুরী—ও ঠিকানাটা দেখছিলো। রায়চৌধুরী—স্টেশন রোড বালিগঞ্জ—এটাই হবে নিশ্চই। সঙ্গে সঙ্গে ওর নজরে পড়ল ঐ একই রাস্তায় আর তিনজন রায়চৌধুরীর টেলিফোন আছে। কোনজন হবে ? রেণুদের বাড়ির পাশেই যখন, ওর হঠাৎ মনে পড়ল, আর মনে পড়ে শরীর হিম হয়ে গেলো, রেণুকে কোনদিন বাড়ির নম্বর জিজ্ঞাসা করেনি সুমিত। রেণুও কোনদিন বলেনি তাকে। শুধু জানে সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামে একটা বিরাট মিষ্টির দোকানের সামনের বাড়ি ওটা।'

এখন কি হবে! হঠাৎ প্রথম নম্বরটা ডায়েল করলো ও, চারটের একটা তো নিশ্চয়ই হবে। রিং হচ্ছে ওদিকে। একজন ফোন ধরলো, বেশ হেঁড়ে গলা। সুমিত নম্বরটা যাচাই করতে ওপাশ থেকে বললো, 'হ্যাঁ, কাকে চাই ?'

গলাটা নরম করে সুমিত বললো, 'দেখুন খুব জরুরী দরকার, আপনার পাশের বাড়ি থেকে রেণুকে ডেকে দেবেন ?' সঙ্গে সঙ্গে

একটা ধমকানি শুনলো ও, 'ইয়ার্কি মারার জায়গা পাও না, না?' কট্ করে কেটে গেলো লাইনটা। মাথা নেড়ে ফোনটায় ডায়েলিং টোন আবার ফিরিয়ে আনলো সুমিত। দ্বিতীয় নম্বরটায় ডায়েল করতে অনেকক্ষণ রিং হলো। তারপর একটি মহিলাকণ্ঠ বলে উঠল, 'হে-লো-ও।' খুব বিনীত গলায় সুমিত বললো, 'দেখুন আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি আপনার পাশের বাড়ির রেণুব সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কোন রেণু?' কণ্ঠস্বরে লবঙ্গলতিকা ভাব।

আর কোন রেণু আছে নাকি, একটু ঘাবড়ে গেলো সুমিত, 'রেণু-মানে রেণু রায়, য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে।'

মৃদু হাসির শব্দ, 'আপনিও কি য়ুনিভার্সিটিতে পড়েন?'

'হ্যাঁ ওকে আমার দরকার।' তাড়াতাড়ি করছিলো সুমিত।

'আমাকেই বলুন না, আমি দেখতে খুব খারাপ নই, খিলখিলিয়ে হেসে উঠল কণ্ঠ, 'ঢং সত্যি বলতো তুমি কে? তোমার গলা আমি চিনি না, না? শোন, এখনই চলে আসতে পারবে? বাড়িতে কেউ নেই, আমি একা, গ্রেট চান্স!'

ফোনটা নামিয়ে রাখলো সুমিত। বাপ্‌স। এখন আছে আর দুটো নম্বর বাকী। এমন সময় কাউণ্টারের ভদ্রলোক বললেন, 'একটা টাকা দিন।'

সুমিত বলতে চাইলো, আমার এখনো—।'

বাধা দিলেন ভদ্রলোক, 'বুঝতে পেরেছি। আমার এখান থেকে এসব ফোন আমি পছন্দ করি না। ফোনে মেয়েদের ডিস্টার্ব করছেন আবার—দিন দিন—'

ভদ্রলোকের বাড়ানো হাতে টাকাটা ধরিয়ে বেরিয়ে এলো সুমিত। এখন ওর সর্বাঙ্গে ঘাম জমে গেছে, ধর্মতলা স্ট্রীটের কড়া রোদ কেমন বিবর্ণ লাগছে। ও দেখলো অশোক বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

কাছাকাছি হতেই অশোক বললো, 'কি হলো?

'বুঝতে পারছি না।' অশোকের দিকে তাকাল না সুমিত।

ঘড়ি দেখলো অশোক, 'প্রায় সাড়ে বারো বাজে। আসবে বলে মনে হয় না আর। এই মেয়েছেলে জাতটা এমনি।'

খুব দুর্বল গলায় বললো সুমিত, 'হয়তো অসুখবিসুখ করেছে, কিংবা বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছে না—।'

'আমি বিশ্বাস করি না।' অশোক বললো, 'আজ অবধি কোন মেয়ের বিয়ের দিন অসুখ করছে বলে শুনেছিস ? মেয়েটা যে চাপা গম্ভীর প্রকৃতির বাড়িতে নিশ্চয়ই টের পাবে না। ও মুখে বলে এক ভাবে আর এক।'

আর একটা দক্ষিণের বাস চলে গেলো। রেণু এলো না। আশোক বললো, 'এখন কি করবি ?'

'বুঝতে পারছি না।' খুব ক্লান্ত গলায় বললো সুমিত। ও দেখলো ঝুমা সামনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিকে আসছে। খুব লজ্জা করছে সুমিতের, ঝুমার সামনে ও মুখ দেখাবে কি করে।

ঝুমাকে দেখে অশোক বললো, 'শোন, মনে হচ্ছে কোন গোলমাল হয়েছে, বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে রেণু, আমরা দেখতে যাচ্ছি, তুমি বাড়ি চলে যাও।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো ঝুমা, 'খুব খারাপ লাগছে সুমিত, সরি, আজকের দিনটা এভাবে নষ্ট হলো, যান আপনারা, আশাকরি মারাত্মক কিছু হয়নি ওর।' ঝুমার দিকে তাকাল সুমিত, মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারছে না ও।

ঝুমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে অশোক বললো. 'চল।'

সুমিত ঘাড় নাড়লো, 'না।'

'কেন ?'

'বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। রেণু চাইবে না আমরা যাই।'

'ছাড়তো, তোর এখন অবশ্যই যাওয়া উচিত। এতদূর এগিয়ে এসে কোন মেয়ের রাইট নেই এভাবে কেটে পড়ার। তোরও যদি

ইচ্ছে না থাকতো তাহলে অন্য কথা হতো। তুই চল, ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেল আজই।' খুব দৃঢ় গলায় বললো অশোক।

ভয় এবং দুঃখ থেকে মানুষের মনে একধরনের শক্তির জন্ম নেয়, যা তাকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার রসদ জোগায়। অদ্ভুত এক হতাশার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুমিত সেইরকম একটা অবলম্বন খুঁজছিলো। এখন ও একবার রেণুকে যদি দেখতে পেত বেণু নিশ্চয়ই বলবে কি হয়েছে আর তাহলেই সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। তবু সুমিত বললো 'ওর বাড়ির লোক খুব গোঁড়া।'

উল্টোদিকের বাস স্টপে এগিয়ে যেতে যেতে অশোক বললো, 'সেটা আমার উপর ছেড়ে দে।'

বালীগঞ্জ স্টেশন রোড ধরে এগোতে এগোতে অশোক বললো, 'বাড়ির নম্বরটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিসনি, কি প্রেম করছিস বাবা! বাবার নাম কি?'

সুমিতের খুব সঙ্কোচ হচ্ছিলো ব্যাপারটা, নিজের কাছেই কেমন হাস্যকর মনে হচ্ছে। সত্যি তো এতদিন এসব চিন্তাও করেনি। রেণুর বাবা কিংবা দাদার নাম অথবা তাঁরা কি করেন—এইসব ব্যবহারিক প্রশ্ন কোনদিন মাথায় আসেনি। রেণু যখন আসতো তখন অন্যকোন কথা মনে করার কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু এখন অশোকের প্রশ্ন শুনে মনে হলো এই যে এর উত্তর দিতে পারছে না খুব স্বাভাবিক ভাবেই অশোক ওদের সম্পর্কের গভীরতা সম্বন্ধে আস্থা হারাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সুমিত বললো, 'ওসব ডিটেলস আমি কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি ওকে। তার চেয়ে চল, ফিরে যাই, আমার ভাল লাগছে না।'

ঠিক সেই সময় অশোকের নাম ধরে একটা গলা চেঁচিয়ে ডাকলো। ওরা দেখলো মোড়েই একটা চায়ের দোকানে ছেলেরা আড্ডা মারছে। তাদের একজন হাত তুলে অশোককে ডাকছে। সুমিত বললো, 'চিনিস নাকি এ-পাড়ার কাউকে?' অশোক কিছু বলার আগে ছেলেটি বেরিয়ে এল। রোগা, ফরসা, ছিপছিপে গড়ন,

চোখে চশমা আছে, অশোককে দেখে হৈহৈ করে জড়িয়ে ধরলো, 'আরে ব্বাস গুরু, তুমি এপাড়ায়, আমি শালা প্রথমটায় চিনতেই পারছিলাম না।'

'বিপ্লব না ?' অশোক বিস্ময় কাটিয়ে উঠলো, 'কি আশ্চর্য, তুমি এখানে।'

'বাঃ, এটাতো আমার পাড়া। বছর পাঁচেক হলো এখানে চলে এসেছি আমরা। এসো এসো চা খাবে।' প্রায় জোর করে ওদের রেষ্টুরেণ্টে ধরে নিয়ে গেল বিপ্লব। সুমিত দেখলো এই ভরদুপুরেও কয়েকটি ওদের বয়সী ছেলে আড্ডা মারছে দুটো টেবিল জুড়ে। ছেলেগুলোকে দেখলে বোঝাই যায় বেকার, দু-একজনের গালে মাথায় কাটা দাগ আছে। কথাবার্তাও সুবিধের নয়। সুমিতদের আড়চোখে দেখলো ওরা। এদের সঙ্গেই বিপ্লব আড্ডা দিচ্ছিলো।

অশোক পরিচয় করিয়ে দিলো ওদের। বিপ্লব অশোকের সঙ্গে একসময়ে মেট্রোপলিটনে পড়ত। খুব ডানপিটে ছেলে। বিপ্লব বললো ও এখন রাত্রে এম কম পড়ছে। দিনের বেলা চাকরীর ধান্দায় আছে।

চা দিতে বলে বিপ্লব জিজ্ঞাসা করলো, 'এই দুপুরে এপাড়ায় কোথায় যাচ্ছ গুরু।' কথাটা শুনে অশোক আড়চোখে সুমিতের দিকে তাকালো। তারপর যেন মহা ঝামেলায় পড়ে গেছে এমন ভঙ্গীতে বললো, 'আরে আর বলো না, যুনিভার্সিটির ইলেকশন আসছে, তোমাদের এ পাড়ার একটি মেয়ে নমিনেশান পেপার সাবমিট করে আর যাচ্ছে না। খোঁজ নিতে এসেছি কি ব্যাপার।'

'আমাদের পাড়ার মেয়ে ইলেকশনে লড়ছে।' অবাক গলায় চেঁচিয়ে উঠলো বিপ্লব, 'কে ভাই ?'

বিপ্লবের গলা শুনে ওপাশের আড্ডাটা চুপ মেরে গেল আচমকা। সুমিত দেখলো ওরা এদিকে তাকিয়ে আছে। অশোক আবার একি গল্প ফেঁদে বসলো, সুমিত অস্বস্তিতে বাইরের দিকে তাকালো।

'চিনবে তুমি ?' অশোক বললো।

'বাঃ চিনব না কেন? এ পাড়া থেকে মোট পাঁচটা মেয়ে য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে যায়। ইলেকশনের ক্যাণ্ডিডেট হিসেবে ভাবা য'য় না কাউকে।' বিপ্লব চায়ের কাপ এগিয়ে দিলো।

'রেণু, রেণু রায়।' অশোক চায়ে চুমুক দিলো।

সুমিত দেখলো বিপ্লবের মুখ কেটে যাওয়া দুধের মত হয়ে গেলো। ফিস ফিস করে ও বললো, 'রেণু? কি বলছ কি?'

অশোক বললো, 'চেনো?'

বিপ্লব ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুদের দেখলো, ওরাও শুনতে পেয়েছে। এখন কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছে। বিপ্লব বললো, 'হাড়ে হাড়ে।'

'কেন, মেয়ে কেমন? ডোবাবে না তো?' অশোক খুব ভাল অভিনয় করতে পারে, মনে মনে সুমিত বললো। ও এমনভাবে চা খেতে খেতে কথাটা বললো যেন কিছুই হয়নি। বিপ্লবের হাড়ে হাড়ে চেনা ব্যাপারটা সুমিতের খারাপ লাগছিলো। ও দেখলো ওর সামনে রাখা চায়ের কাপে সর পড়ছে একটু একটু করে।

হাসতে হাসতে বিপ্লব বললো, 'কোথায় খাপ খুলেছো শিবাজী, এযে পলাশী। এ জিনিস কোন ফ্রেমে বাঁধানো যাবে না মাইরি। আমরা সব কটা ওর হাফসোল খাওয়া মাল। অল সেকেণ্ড হ্যাণ্ড।'

অশোকও হাসলো, 'ব্যাপারটা কি?'

'দারুণ কেসিয়াস মেয়ে ভাই। কতগুলো কেস আছে ভগবান জানে। ঐ যে দেখছো কালো গেঞ্জি ওর নাম সুখেন। তিন বছর ওকে গড়িয়াহাটা মোড় থেকে এই রাস্তা অবধি হাঁটিয়ে এনেছে। স্রেফ কিছু না, ও কলেজ থেকে আসতো, নামতো গড়িয়াহাটে। সুখেনবাবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন ওর জন্যে। তারপর তিনি হেসে হেসে গল্প করে করে এই অবধি এসে কাটিয়ে দিতেন ওকে। সুখেন চেষ্টা করেছে রেস্টুরেন্টে ঢোকাতে, পারেনি। ভিক্টোরিয়া, লেক, সিনেমা—কোন চান্স পায়নি সুখেন।'

সঙ্গে সঙ্গে সুমিত শুনলো কালো গেঞ্জি পরা ছেলেটি চাপা গলায় কি বলে উঠতেই আর সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

হঠাৎ বিপ্লব বললো, 'শুনলাম য়ুনিভার্সিটিতেও নাকি কাউকে খুব ড্রিবল করাচ্ছে। বেচারার প্রেমের কবরে আমাদের ফুল দেওয়া থাকলো।' আবার হো হো হাসি উঠলো রেস্টুরেণ্টে। সুমিতের মনে হলো ও যদি উঠে সটান বিপ্লবের নাকে একটা ঘুষি মেরে দিতে পারতো, সুমিত দেখলো অশোকের চটিপরা পা ওর পায়ের ওপর আলতো করে চাপ দিলো।

অশোক বললো, 'এসব বাবা তোমাদের ব্যাপার তোমরা বোঝ, আমাদের চিন্তা ইলেকশন নিয়ে। মেয়েটা কোন বাড়িতে থাকে?'

ওপাশের বেঞ্চিতে একটা ছেলে ফস করে বললো, ঐ যে সামনে মিষ্টির দোকান দেখছেন তার উল্টো দিকে, হলুদ বাড়ি।'

অশোক বিপ্লবকে বলল, 'তুমি চল আমাদের সঙ্গে।'

সঙ্গে সঙ্গে হাত পা নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠলো বিপ্লব, 'ভাই আমার লাইফ ইন্সুরেন্স নেই, ঐ বুড়োর একটা রদ্দা খেলে আমি মরে যাবো। আর ওর মায়ের মুখের যা জোর ঐ রদ্দারও বাবা। একমাত্র ওর দাদাই যা কিছু ভদ্রলোক। তা আমরা তো পাড়ায় দেখিই না বলতে গেলে। তুমি ওখানে ইন কর, আমি বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাড়িটা একতলা, সামনে রেলিং দেওয়া রোয়াক। জানালাগুলো বন্ধ। বিপ্লব ওদের দেখিয়ে দিয়ে চলে যেতে অশোক বললো, 'ওর বাবার সঙ্গে যা বলার আমি বলবো। তুই চুপ করে থাকবি।' সত্যি বলতে কি সুমিতের এখন কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না। রেণু সম্পর্কে এই ছেলেগুলো যা বললো তা হিংসে থেকে বলা যেতে পারে। তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলো না সুমিত। কিন্তু এখন সবার সামনে রেণুর কাছে জবাবদিহি চাইতে ওর মন সায় দিচ্ছিলো না। এ ব্যাপারটা ও আলাদা করে নিজেই করতে পারতো। ওর মন বলছে আজকে রেণুর না যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন গোপন

গুরুতর কারণ আছে । হয়তো রেণু সেকথা সবার সামনে উচ্চারণ করতে পারবে না।

কলিং বেলের বোতামে চাপ দিলো অশোক। এখন প্রায় ছুটো বাজে। চারধারে রোদ খাঁ খাঁ করছে। সুমিত দেখলো সামনের মিষ্টির দোকানে বসে ছুটো ছেলে কৌতূহলী চোখে ওদের দেখছে। একটা ঝি মতন মেয়ে ঘোমটা টেনে দরজা খুলে দিয়েই ভিতর চলে গেলো তাড়াতাড়ি। সুমিত শুনলো বেশ হেঁড়ে গলায় একজন জিজ্ঞাসা করলো, 'কে ওখানে ?'

ওরা ঘরে ঢুকলো। বেশ বড় ঘর। সামনের দেওয়াল ঘেঁসে সোফা সেট। বাঁ দিকে একটা ডিভান পাতা। সামনের দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবি তার নিচে লেখা, হে ভারত ভুলিও না—। সোফায় বসে আছেন যিনি তিনিই প্রশ্নটা করেছেন। গোলগাল চেহারা তবে বোঝাই যায় ব্যায়াম-ট্যায়াম করতেন এককালে। পঞ্চাশের ওপারে বয়স যদিও, তবু বাইসেফগুলো দেখা যায় বেশ। লুঙ্গি পরা, খালি গা। মাথায় ছোট করে চুল ছাটা। মনে হয়, মাথাটা কে যেন ঘাড়ের ওপর আচমকা বসিয়ে দিয়েছে। মুখটা গোল। ওদের দেখে চোখ ছোট হয়ে গেল ভদ্রলোকের, বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করলেন আবার, 'কি চাই ?'

সুমিত উসখুস করলো। অশোক বললো, 'এটা, মানে এখানে কি রেণু রায় থাকেন ?'

'কোথেকে আসা হচ্ছে ?' গলার স্বর রুক্ষ হয়ে গেলো হঠাৎ।

'য়ুনিভার্সিটি থেকে। ওকে একটু ডেকে দেবেন ?' অশোক নির্বিকার গলায় বললো। পা ছড়িয়ে বসেছিলো ভদ্রলোক, চকিতে চটি জোড়া টেনে নিয়ে সোজা হলেন, 'কি দরকার ?'

'দরকার আছে নিশ্চয়ই, নইলে এই ছুপুরে আসতাম না। অশোক হাসলো, 'ওকে ডেকে দিন।'

'যা দরকার আমাকে বলো। আমি ওর ফাদার।' গর্জন করে উঠলেন ভদ্রলোক। সুমিত দেখলো ওর গলার নালি কাঁপছে।

সুমিত কিছু বলতে যাচ্ছিলো অশোক হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলো, 'সব কথা তো সবাইকে বলা যায় না, তাছাড়া আপনি আমাদের সমবয়সী নন। বরং রেণুকেই ডেকে দিন।'

'গেট আউট, আই সে গেট আউট।' গম গম করে উঠল ঘর।

'তা কি হয়! এতদূর থেকে এই রোদ্দ্‌রে আমরা তো মিছিমিছি আসিনি। ওর যাবার কথা ছিল—।'

'আই সি, তাহলে তুমিই সেই ডিবচ্‌। রেজেষ্ট্রী করবে রেণুকে। দাঁড়াও, আমি তোমাকে পুলিশে দেব, দীপক দীপক—।' চেঁচাতে লাগলেন ভদ্রলোক। ভিতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ গলা, বোধহয় পর্দার পাশেই ছিলেন মহিলা, ভেসে এলো, 'দূর করে দাও না, চাল নেই চুলো নেই—সাহস দেখে মরে যাই, বাড়ি বয়ে এসেছে দ্যাখো। দীপু বাড়ি নেই।' গলাটা শুনে সুমিত অনুমান করলো বিপ্লবের কথামত এই তাহলে রেণুর মা। অশোক বললো, আপনি ভুল করছেন, রেণুর সঙ্গে বন্ধুত্ব এর, আমার বন্ধু। ঠিক আছে আপনি যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাইছেন না, তাহলে আপনাকেই সব বলি, শুনুন। কিন্তু বসতে বলবেন তো?' ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ঘটে গেলো ব্যাপারটা। তীরের মত পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো রেণু। তারপর ছুটে এসে সুমিতের হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে এলো। চমকে গিয়েছিলো সুমিত। অবাক হয়ে দেখলো রেণুর চোখে জল, কাঁদলে রেণুকে এরকম সুন্দর দেখায় যে, বুকের মধ্যে হাঁপ ধরে যায়।

লোহার রেলিং ঘেরা রকে দাঁড়িয়ে রেণু বললো, 'আমি তো তোমাকে কতবার বলেছি, আমি খারাপ, খুব খারাপ, তবু তুমি কেন এলে, কেন?' রেণু কাঁদছিলো। সুমিত বললো, 'রেণু, তুমি কেন এলে না, রেণু?'

'লোকে তো কত কিছু ত্যাগ করে, আমাকেও না হয় তুমি ত্যাগ করলে। আমাকে তুমি ক্ষমা করো-ও।' ফোঁপাতে লাগলো রেণু। সুমিত শুনলো ভিতর থেকে রেণুর বাবা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে

ওকে ডাকছেন। অশোক দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। সুমিত দেখলো সামনের মিষ্টি দোকানের ছেলে দুটো বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁ করে ওদের দেখছে। রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে, তাঁদেরও নজর এদিকে।

সুমিত চাপা গলায় বললো, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো রেণু, আমি তোমাকে কি করে বোঝাবো—।'

ওর হাত রেণুর মুঠোয় তখনো ধরা। রেণু কাঁপছিলো। 'তুমি যাও, পায়ে পড়ি তোমার, যদি তুমি ভালবাসো আমাকে, তাহলে এখন চলে যাও। আমি তোমাকে সব জানাবো, কথা দিচ্ছি, তিনটে দিন আমাকে সময় দাও, প্লিজ।'

রেণুর বলার মধ্যে এমন একটা স্বর ছিলো সুমিত সরে দাঁড়ালো। মিষ্টি দোকানের সামনে জটলাটা বাড়ছে। রেণু আবার দ্রুত ফিরে গেলো ভিতরে। রেণু চলে যেতেই অশোক বেরিয়েই এলো, সুমিতের দিকে তাকিয়ে বললো, 'চল্'।

রাস্তায় নামতে নামতে হঠাৎ সুমিতের মনে হ'ল রেণু এখন অনেক অনেক দূরের মানুষ। চট করে কাছে গিয়ে কিছু দাবী করা যায় না। ভালবাসি শব্দটা সেই দূরত্ব অবধি পৌঁছায় না। সুমিত শুনলো, একটা ছেলে অশোককে জিজ্ঞাসা করছে, 'কি হয়েছে দাদা কেসটা কি?'

অশোক বললো, 'পারিবারিক ব্যাপার, ও কিছু নয়।'

ছেলেটা আরো কিছু বলে ঝামেলা পাকাবার তালে ছিলো আর একজন বললো, 'বিপ্লবদার বন্ধু এরা।

উল্টো রাস্তায় হাঁটতে লাগলো অশোক। সুমিত বুঝতে পারছিলো ও এখন বিপ্লবদের রেস্টুরেন্টটা এড়িয়ে যেতে চায়। খানিকটা দূরে এসে অশোক বললো, 'এই জন্যই শালা আমি প্রেম ট্রেম করি না। ধর তক্তা মার পেরেক। তুই শালা যদি ডায়মণ্ডহারবারে ঘর ভাড়া নিতিস তাহলে আজ আর আফসোসের কিছু থাকতো না। মেয়েটাকে চুমু টুমু খেয়েছিস কখনো, না সেখানেও সতীত্ব।'

সুমিতের সমস্ত শরীর হঠাৎ থর-থর করে উঠলো, কিছু বোঝার আগেই ওর হাত উঠে গেলো ওপরে। প্রচণ্ড জোরে চড় মারলো অশোকের মুখে। ছিটকে সরে গিয়ে দু'হাতে মুখ চেপে ধরল অশোক। ও এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিলো যে ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিলো। সুমিত যে ওকে মারতে পারবে হয়তো চিন্তার বাইরে ছিলো ওর। চড় মেরেই সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেলো সুমিতের। ও চোখ বন্ধ করে অন্ধকার দেখলো।

সুমিত শুনলো অশোক বলছে, 'সাবাস'। চল, এবার নিশ্চয়ই মদ খাবি তুই। তোদের মত দেবদাসদের পাছায় জোড়া লাথি মারতে হয়।'

সুমিত কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ ও দেখলো ওর চোখে জল এসে যাচ্ছে। ও প্রাণপণে শক্ত হতে চাইলো। অশোক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কাছে এসে বললো, 'চল, কফি হাউসে গিয়ে একটু আড্ডা মারা যাক।'

সুমিত এই প্রথম বুঝতে পারলো (চোখের পাতার আড়াল বড় পলকা, এক বিন্দু জোর নেই।)

তিন তিনটে দিন যেমন যায়, তেমনি চলে গেলো। না, রেণুর দেখা পেল না সুমিত। রেণু যুনিভার্সিটিতে আসছে না। ভীষণ রকম আশা করেছিলো সুমিত, রেণু ওর কথা রাখবে। চতুর্থ দিন সকালে অশোক এলো হোস্টেলে, এসে বললো, 'তোর রেণুর বিয়ে।'

তিন দিন ধরে বুকের মধ্যে কে যেন বসে ফিসফিস করে বলছিলো এরকম কিছু হবে, এরকম কিছু হবে। অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো সুমিত। অশোক কথাটা কি ভাবে বলবে, এই নিয়ে অস্বস্তিতে ছিলো, সোজাসুজি বলতে পেরে খুশী হলো, 'একদিক দিয়ে ছাখ ভালই হয়েছে। পড়াশুনা ছেড়ে তুই চলে যেতিস চা-বাগানে কিন্তু সুখী হতে পারতিস কিনা সন্দেহ। রেণুর মত অস্থির মনের মেয়েকে নিয়ে সুখী হওয়া যায় না। বরং আমি বলবো এটা তোর শাপে বর।'

অনেকক্ষণ বাদে সুমিত কথা বললো, 'তুই জানলি কি করে ?'

'আজকে আবার বিপ্লবের সঙ্গে দেখা। সকালে ফিয়ার্লি প্লেসে গিয়েছিলাম হায়দ্রাবাদের টিকিট কাটতে ওখানে ও এসেছিলো। বললো আমরা যেদিন যাই সেদিন নাকি পাত্রপক্ষ এসে ওকে দেখে-ফেকে গেছে। তুই ভাব, ও দুপুরে তোর সঙ্গে রেজিস্ট্রী করবে কথা দিয়ে তোকে অপেক্ষা করিয়েছে, আর বিকেলে সে সেজে পাত্রপক্ষের সামনে বসে 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে' গেয়েছে। তুই বলতে চাস ও জানতো না ? এক'শবার জানতো। এখন বোঝ এই জাতটা কিরকম।' বলে উঠে দাঁড়ালো অশোক, 'সামনের সোমবার আমি কাটছি।'

সুমিত অশোককে আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'বিয়েটা কবে জানিস ?'

মাথা নাড়লো অশোক, 'না, তা বিপ্লব জানে না। আচ্ছা, 'আমাকে তোরা একটা ফেয়ারওয়েল দিবি না, এই যে আমি চলে যাচ্ছি তুই তো কিছু বলছিস না ?'

হাসলো সুমিত, 'ফেয়ারওয়েল ! সেটা তো অনেককেই দিতে হয়, হয় না ?'

'যাচ্চলে। তোকে নিয়ে কিছু হবে না। আমি কাটছি এখন, যাবার আগে বেশ জোর আড্ডা মারবো কিন্তু।'

সেদিন বিকেলের ডাকে চিঠিটা পেয়ে গেলো সুমিত। বেশ মোটা খাম। ওপরে সুন্দর করে সুমিতের ঠিকানা লেখা। বাঁ দিকে কি লিখে কেটে দিয়েছে রেণু, কাটা অক্ষরগুলোয় কালি বুলিয়ে দিয়েছে।

চট করে প্রথমেই একটা নদীর কথা মনে পড়ে।

য়ুনিভার্সিটি থেকে ফিরে দরজায় লেটার বক্সে পড়ে থাকা খামটা নিয়ে সুমিত দ্রুত নিজের ঘরে চলে এলো। বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে, কি লিখেছে রেণু ? এখন, সব যখন শেষ, কি বাকী থাকে বলার ! সান্ত্বনা না কৈফিয়ৎ ? কি মনে হতে দরজা বন্ধ করে দিলো ও।

খামটা খুলতেই এই সন্ধ্যেবেলার ঘর আশ্বিনের পুজো পুজো রোদ্দুরে মাখামাখি হয়ে গেল। আস্তে আস্তে গ্লসি পেপারে প্রিন্ট করা ছবিটাকে সামনে ধরলো ও রেণু ঘাড় কাৎ করে হাসছে। মাথার দুপাশে চুলের গোছা যেন পোস্টকার্ড সাইজের এই ফটোটা ধরে রাখতে পারছে না। সেই গভীর কালোর পটভূমিতে ওর ফরসা মুখখানা ঈষৎ উপরে তোলা, রেণু হাসছে। হাসলে ওর গজদাঁত দেখা যায়। আর কী আশ্চর্য, বড় বড় যে চোখে খুশির ঝিলিক, সে চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ডাইনে বাঁয়ে মুখ ফিরিয়ে সে চোখের মণির আড়াল হতে পারলো না সুমিত। কপাল রেণুর একটু বড় তাতে টিপ পরেছে খুব বড় করে। মুখ ওপর করা বলে রেণুর নরম গলার সবটুকু দেখা যাচ্ছে। নিচে ছোট্ট গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, 'এই আমি রেণু।' চোখ বন্ধ করে ফেললো সুমিত। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কে যেন বলে উঠলো', এই আমি রেণু। ছবিটার ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ বেরিয়ে আসছে, রেণুর হাতের গন্ধ। ভীষণ চেনা। এই গন্ধ কতদিন থাকবে? মানুষ কতদিন তার সুবাস রেখে যেতে পারে স্মৃতিতে।

সঙ্গে আসা পুরু চিঠিটা খুললো ও। চিঠিতেও সেই হাতের গন্ধ। চার ভাঁজ করা সাদা কাগজে লেখা চিঠি। না, কোন সম্বোধন নেই। ওপরের ডানদিকে, গতকালের তারিখ। শুরুতেই কী লিখে কেটে দিয়েছে রেণু। কাটা জায়গাগুলো কেটে একবারে তৃপ্তি হয়নি, বার বার কালি বুলিয়ে শেষে একটা নৌকোর মত চেহারা করে দিয়েছে। এটা ওর মজার খেলা। কিছু লিখতে গিয়ে ভুল হয়ে গেলেই ও রবীন্দ্রনাথের নকল করতো। ও কি এটা অন্যমনস্ক হয়ে করেছে? কে জানে। তারপরই দুমদাম করে শুরু হয়ে গেল চিঠিটা 'আমার বিয়ের খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছ এতক্ষণে, দিনটা এসে গেল বলে—।'

দুই

দোতলার বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে ছিলো বরেন, বরেন মুখার্জী। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এখন। চুপচাপ বসে সামনের রাস্তায় একটু আগে জ্বলে ওঠা আলোগুলো দেখছিলো ও। একটু একটু বাতাস দিচ্ছে। যেহেতু ওদের ফ্লাটের দক্ষিণটা খোলা, হাওয়া আসে খুব। এই বারান্দায় এমনি ভাবে বসে থাকা ওর খুব প্রিয় অভ্যাস। ইদানিং কাজের চাপ বেড়েছে অফিসে। যে পোস্টে ও কাজ করে সেখানে এটাই স্বাভাবিক আর তা নিয়ে কোন অভিযোগ ওর নেই। চার অঙ্কের দু ঘরের মাইনে ওকে মুখ দেখে দেওয়া হয় না।

পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফেরালো বরেন। নীরেন বাইরে এলো। বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে নীচের দিকে দেখলো। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'ব্রজবিলাসবাবু আসেন নি?'

প্রথমে ঠাওর না করলেও বরেন বুঝলো প্রশ্নটা। ঘাড় নেড়ে বললো, না। নীরেন বললো 'লোকটা গুড ফর নাথিং। তুমি আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? আমি একদিনে টাইট করে দিতাম লোকটাকে।

বরেন হাসলো। এই কথাটা নীরেন ওকে অনেকবার শুনিয়েছে। সে রকম ইচ্ছে হলে বরেন নিজেই তো কত কি করতে পারতো। তার জন্য নীরেনের কলেজের বন্ধুদের দরকার নেই। নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি সামান্য প্রয়োগ করলেই ছেলেটি শেষ হয়ে যেতে পারে। ইদানিং নীরেন যাকে লোকটা বললো, তাকে ও ছেলেটা ভাবছে। কত আর বয়েস হবে। নিঃসন্দেহে ওর থেকে ছোট হবে। অনেক ছোট। চোখ থেকে চশমা খুলে দুই আঙুলে চোখের পাতা চেপে

ধরলো ও। এখন সবকিছু ভেবেচিন্তে করতে হবে। তার যে বয়েস নীরেন সেখানে এলে নিশ্চয়ই এমনই করতো। প্রায় আঠারো বছরের ছোট ও। এখানে মনে পড়ে ও যখন কলেজে ভর্তি হয়েছে তখনই নীরেন হলো। খুব লজ্জা লাগতো তখন। বন্ধুদের বলতে পারতো না ওর ভাই হয়েছে। সেই ভাই এখন এত বড়সড় অল্পেই উত্তেজিত হয়। এই আটত্রিশ বছর বয়সে শরীর ঠিক আছে বরেনের। একটুও মেদ জমেনি, শুধু সামনের চুলগুলো পাতলা হয়ে গেছে এই যা। আর যেমন হয়ে থাকে, ওর মুখের ওপর সেই ছোট ছোট রেখাগুলো এই কয়মাসে গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

'ওকে তুমি যেতে দিয়ে ভাল করোনি দাদা।' নীরেন বললো।

আমি যেতে দিইনি, ও গিয়েছে। ওর বাবাকে আমি সম্মতি দিইনি, কিন্তু—।' এইখানটাই বিশ্রী লাগছে ওর। ও এতে আপত্তি করেছে তা সত্ত্বেও এক প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে রেণু চলে গেল। রেণুর বাবার সামনে বরেন ওকে বলেছিলো, 'তুমি চলে যাচ্ছো এবং এটা তোমার শেষ যাওয়া হতে পারে, ভেবে দ্যাখো।' একটাও কথা বলেনি ও, মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়েছিলো। ওর বাবা ট্যাকসী ডেকে আনতে সোজা নেমে গেল নিচে।

নীরেন একটু উসখুস করলো। ইদানিং দাদার সঙ্গে ও সব কথা খোলাখুলি বলার সাহস পাচ্ছে। বিয়ের পর থেকে হঠাৎ দাদার সঙ্গে ব্যবধানটা কমে গেছে ওর। বাইরে ও যে সব বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয় দাদা তাদের কোনকালেই পছন্দ করে না। এখন সব ব্যাপারেই কেয়ার করি না একটা ভাব এসে গেছে নীরেনের মধ্যে। পাড়ায় ও এখন নেতা গোছের, বাড়িতেও সেই ভাবটা একটু একটু করে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে বলে বরেনের সামনে দাঁড়িয়ে এইসব কথা বলার সময় কোন সঙ্কোচ বোধ করে না ও আজকাল।

'ওর কথা শুনে ওরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে চিঠিটা উদ্ধার করতে।' নীরেন আবার বললো। বরেন তাকালো ভাই-এর দিকে, তারপর

হাসলো, 'তোর কি মনে হয় টাকার লোভ গায়ের জোরের কাছে হেরে যাবে ?'

কথাটা শুনে একটু কাঁধ নাচিয়ে নীরেন ফিরে রাস্তার দিকে তাকাতেই বলে উঠলো, 'ঐ যে আসছেন। হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে না কোন ভাল খবর আছে।' বরেন সোজা হয়ে বসলো, 'ব্রজবিলাস ?' নীরেন ঘাড় নাড়লো, তারপর ঘরের ভিতর চলে গেল, বোধহয় দরজা খুলে দিতে।

নীরেনের চলে যাওয়া দেখলো বরেন। ভাই-এর এত কৌতূহল ওর ভালো লাগছে না। ওর সামনে বা ওর সঙ্গে নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে। কিন্তু রেণু এমন সব ব্যাপার করে বসলো, যা কারো সামনে থেকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না। এখন ব্রজবিলাস আসবে, ওর সঙ্গে যদি একা কথা বলা যেত! কিন্তু বরেন দেখলো ব্রজবিলাসকে বারান্দায় নিয়ে এলো নীরেন, এসে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলো।

রোঁয়া ওঠা টেরিলিনের সার্ট পরে ব্রজবিলাস বাঁ হাতের কনুই-এর ওপর লাল সুতোয় বাঁধা পেতলের তাবিজ ডান হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা ছুঁচলো, চোখ দুটো বরেনের পায়ের দিকে নামানো।

বরেন বললো, 'বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে কথার ফোয়ারা ছুটলো, ব্রজবিলাস হাত পা নেড়ে বলতে লাগলেন, যেন বরেনের অনুমতির জন্য চুপ মেরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো, 'কি বলবো স্যার, মেরে একদম ফ্লাট করে দিয়েছে, হাড় গোড়গুলো যে কি করে আস্ত থেকে গেলো ভগবান জানে। মুখটা যদি একবার দেখতেন, কাটা পাঁঠার মত রক্তে মাখামাখি।'

কাকে মেরেছে ? কে মেরেছে ?' নীরেন চটপট জিজ্ঞাসা করলো।

'আমাদের পার্টিকে। দুদিন ধরে জপিয়ে জপিয়ে কিছুতেই টোপ গেলাতে পারছি না। তা আমিও তো ছাড়ার পাত্র নই, এর

চেয়ে কতবড় শক্ত কেস—। এই সেবার বালীগঞ্জ প্লেসের এক জাঁদরেল মেয়েছেলে—'।'

হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দিলো বরেন, 'কাজের কথা বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লো ব্রজবিলাস, 'রেফারেন্স স্যার, আপনি বুঝতে পারতেন। তা আমি পার্টিকে সকালে বলেছিলাম যে অফিস ছুটির পর ওর সঙ্গে দেখা কববো। সেইমত আমি ঠিক সময়ে হাজির। দেখি মিনিট পনের বাদে উনি বেবোলেন। তারপর সোজা গভর্ণমেণ্ট প্লেস দিয়ে রাজভবনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। একটু নিরিবিলিতে ধরবো বলে আমিও পেছন পেছন যেতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি ঠিক নিরিবিলি নয়, আরো কয়েকজন এপাশ ওপাশে আছে।' একটা ঢোঁক গিললো ব্রজবিলাস। একবার ভাবলো কাল রাত্রে সুমিতের ঘরে যাবা ঢুকেছিলো তাদের কথা বলবে কিনা। তাবপর নিজের মনেই মাথা নাড়লো, এতসব বললে ক্লায়েণ্ট ঘাবড়ে যাবে। সব কথা খুলে বলা ঠিক নয়। 'তারপর স্যার আমি গন্ধটা পেয়ে গেলাম। কেস খুব খারাপ। একবার ভাবি পার্টিকে সাবধান করে দিই, কিন্তু স্কোপ পেলাম না আর। ওরা ওকে ঘিরে ধরলো। তবে খুব বুদ্ধিমান লোক স্যার, একদম নড়ার চেষ্টা করেনি। যা ধোলাই দিলা'না স্যার, আপার কাট, লোয়ার কাট, পাঞ্চ, এক সময় আমি বক্সিং শিখেছিলাম তো। নাইনটিন ফরটি এইটে এক পাঞ্জাবীর সঙ্গে—।'

ধমকে উঠলো বরেন এবার, 'আপনার কথা কে শুনতে চাইছে তারপর কি হলো বলুন!'

'বলছি স্যার, এটা একটা রেফারেন্স, হ্যাঁ উনি তো পাকা কুলের মত টুপ করে মাটিতে খসে পড়লেন। মেরেই ফেলতো হঠাৎ দেখি বৌদিমণির দাদা এসে ওকে আগলে রাখলেন। প্ল্যানটা বুঝলেন স্যার, প্রথমে ধোলাই তারপর প্রেম। কি বললো বুঝতে পারলাম না আমি, হাওয়াটা স্যার খচরামি করে তখন উল্টো দিকে বইতে আরম্ভ করেছিলো। তারপর দেখি ওকে ফেলে রেখে সব হাওয়া।

আমি দেখলাম এই একটা জোর সুযোগ। দৌড়ে একটা ট্যাক্সী নিয়ে ওর পাশে গিয়ে ওকে টেনে ট্যাক্সীতে তুললাম। কী বলবো স্যার, এমন মেরেছে না। রুমাল কেন, গামছা দিয়েও সব রক্ত পরিস্কার করতে পারিনি আমি।'

বরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'আপনি দেখেছেন ও রেণুর দাদা ? সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লো ব্রজবিলাস, 'একদম কারেক্ট স্যার।'

'আপনি ওকে চিনলেন কি করে ?' বরেন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলো। বিনয়ে মুখ নামালো, 'স্যার এটা হলো আমার ট্রেড সিক্রেট। জানতে হয়।'

নীরেন বললো, 'কি বলেছিলাম দাদা, শুয়োরগুলো সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকটিভ হয়ে গেছে। তোমাকে বললাম বৌদিকে যেতে দিয়ে তুমি খুব ভুল করেছ।'

'তারপর কি হলো ?' বরেন পায়চারি করছিলো।

'তারপর স্যার আমি অনেক ভালো ভালো কথা বলে, ডাক্তার দেখিয়ে মেসে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলাম। এখন আমার ওপর একটু নরম স্যার। হাজার হোক, বিপদের সময় এত সেবাযত্ন করলাম, এমনকি ট্যাক্সি ফেয়ার দিতে দিইনি। মনে হচ্ছে টাকার অঙ্কটা একটু যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই কাজ হয়ে যাবে। মানে, আজকের এই ধোলাই-এর পর আর কোন মায়া-মমতা তো থাকার কথা নয়।'

'আপনি নিশ্চিত যে চিঠিটা ওর কাছে আছে ?' বরেন বললো।

হ্যাঁ স্যার। তবে ঘরে রাখেনি। চিঠি যে ওর কাছে আছে, তা আমি মুখ দেখেই বলতে পারি।' ব্রজবিলাস বললো।

হঠাৎ নীরেন উঠে এলো বরেনের সামনে, 'দাদা, তুমি একবার আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দাও। আমি আমার পার্টি নিয়ে—।'

মাথা নাড়লো বরেন, 'না, তোমার যাবার দরকার নেই। এটা পাঁচজনকে চেঁচিয়ে বলার মত সম্মানজনক ব্যাপার নয়।'

নীরেন মুখ তুলে দাদাকে দেখলো। তারপর কি ভেবে আর

কিছু বললো না, আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর চলে গেলো। ব্রজবিলাস বললো 'স্যার!'

বরেন তাকালো।

'স্যার, টাকার মাত্রাটা যদি আর এক হাজার বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে কাজ হয়ে যাবে।' ব্রজবিলাস বললো।

'কিন্তু চিঠিতে কি ছাইপাশ লেখা আছে না দেখে কোন কথা আমি কাউকে দেব না। যদি মনে হয় চিঠিটা দামী তবে না হয় এক হাজার বাড়িয়ে দেওয়া যাবে।' বরেন বললো।

'চিঠিটা তো স্যার দামী, আপনিই বলেছেন। বৌদিমণি তার লাইফের সব ব্যাপার-স্যাপার খুলে লিখেছেন।' ব্রজবিলাস প্রতিবাদ করলো, 'আর ঐ চিঠি তো আপনাকে দেখানোর জন্য আমাব হাতে দিয়ে দেবে না, দেখতে হলে আপনাকেই যেতে হবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলো বরেন, 'ঠিক আছে, আপনি কথা বলুন।'

ব্রজবিলাস আর একটু এগিয়ে এলো, 'আপনাকে একদম চিন্তা করতে হবে না স্যার, আমি সব ব্যবস্থা করছি। আজ তাহলে চলি স্যাব।'

ঘাড় নাড়লো বরেন। তারপর দেখলো ব্রজবিলাস তাবিজ আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই হাসলো লোকটা, 'আজ অনেক খবচা হয়ে গেল স্যার, ট্যাক্সি ভাড়া, চা—ফা—।'

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিল বরেন, 'এবার যখন আসবেন তখন ভালো খবর আনবার চেষ্টা করবেন। আপনার পেছনে অনেক ব্যয় হয়ে যাচ্ছে।'

টাকাটা হাতে নিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে গেল ব্রজবিলাস। এইসব কথার পিছনে কথা বলতে নেই, অনেক অভিজ্ঞতায় এটুকু জেনে গেছে ও।

ব্রজবিলাস চলে যাবার পর বরেন চুপচাপ বসে থাকলো খানিক। ভিতর থেকে কোন শব্দ আসছে না। আজকাল মা বাড়িতে আছেন কি না বোঝা যায় না। নীরেন নিশ্চয়ই বেরিয়ে

গেছে। ঠিক এই মুহূর্তে ভীষণ একলা লাগলো বরেনের। অন্ধকারে একা বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না নিজের ঘরে চলে এলো ও।

আলো জ্বলছিলো ঘরে। চাকরীর সূত্রে পাওয়া এই কোয়ার্টারে অঢেল জায়গা, ঘরগুলো কোলকাতার বলে মনে হয় না। তবে ইদানিং বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ঘরের দুদিকে দুটো খাট পাতা। আসলে জোড়া খাটটাই খুলে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। মাঝখানে বেতের নিচুপায়া সোফাসেট. টেবিল, ওর উপর ডিম সাইজের নীল কাঁচ পাতা। মাথার দিকে দেওয়ালের মাঝামাঝি ছোট টিউবলাইটের নিচে সেই বাঁধানো ছবিটা, বিয়ের পরদিন সকালে যেটা তোলা হয়েছিলো। পায়ে পায়ে বরেন ছবিটার সামনে এসে দাঁড়ালো। ফুলের মালাটা ও খুলে রেখেছিল সেদিন, কিন্তু কপালে পরিয়ে দেওয়া চন্দনের টিপটা এখনো ছবিতে বোঝা যায়। রেণু তাকিয়ে আছে সামনে, ঠোঁট এমন করে চেপে আছে, হাসছে কিনা বোঝা মুস্কিল। বেনারসী শাড়ির ঘোমটায় রেণুকে সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখ দুটো বেশ বড়, পরিষ্কার চাহনি, কপালটা চওড়া আর তাতে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরা, সুন্দর। বরং ওর পাশে নিজেকে কেমন বেমানান মনে হলো বরেনের। সত্যি কি বেমানান? হ্যাঁ, ছবিতে অবশ্য ওকে একটু ভারিক্কী বলে মনে হচ্ছে, মুখচোখ দেখে মনে হয় অবশ্য বয়েস হয়েছে। কিন্তু ওর মধ্যে যে স্মার্টনেস এই বয়সেও আছে সেটা তো চমৎকার ধরা পড়েছে ছবিটায়। একটু বেশী বয়সেই বিয়েটা করেছে ও, কিন্তু সত্যি কি বেশী বয়েস এমন? ছত্রিশ বছর বয়েস কি খুব বেশী হলো?

বিয়ে করবো না এমন কোন ইচ্ছে ছিলো না বরেনের। যে সময়টাকে লোকে ঠিক বিয়ের সময় বলে তখন নীরেন খুব ছোট। মনে হতো নতুন বৌ এসে নীরেনকে একটু বড়সড় দেখুক। তাছাড়া মাও কোনদিন উচ্চবাচ্চ করেননি বিয়ের ব্যাপারে। সাধারণত মায়েরাই উদ্যোগী হয় এসব ব্যাপারে। কিন্তু বরেন দেখছে মা খুবই নির্লিপ্ত। আত্মীয়স্বজনরা যখন মাকে প্রশ্ন করেছে তখন উনি

বলেছেন, একদিন তো করবেই, এত তাড়াতাড়ি কিসের। অবশ্য বিয়ে না করে বেশ চলে যাচ্ছিলো ওর। চাকরীর ঝামেলায় অষ্টপ্রহর জড়িয়ে থেকে এক ধরনের সুখ পায় বরেন। রবিবারও অফিস যেত মাঝে মাঝে। এই করতে করতে দিনগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে ছত্রিশে এসে ঠেকলো।

অফিসের কাজে জামসেদপুর যাচ্ছিলো বরেন। উঠবে নটরাজ হোটেলে। সুধাময় গাঙ্গুলি যেচে এসে খবরটা দিলেন। ওদের অফিসের পারচেজিং-এর কর্তা সুধাময়। বরেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও ঠাট্টা ইয়ার্কি করেন। সুধাময় বললেন, ওর এক ভাগ্নী আছে, বিউটিফুল দেখতে, বরেন যদি চায় জামসেদপুরে গিয়ে ওকে দেখতে পারে। মেয়েটিও যাচ্ছে ওখানে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে। কোন ফর্মালিটিস নেই।

বরেন হেসে বলেছিলো, 'বয়েস কতো?'

সুধাময় বলেছিলো, 'মেয়েদের আবার বয়স! পনের পেরিয়ে গেলেই ওরা যে কোন বয়েসের সঙ্গে মানিয়ে যায়। তবে আমার ভাগ্নাকে নেহাৎ বালিকা ভাববেন না, এম. এ. পড়ে, এবারই পরীক্ষা দেবে। লম্বা চওড়া আছে। এই সেদিন ওকে দেখে আমিই চিনতে পারছিলাম না।'

সেইমত যোগাযোগ হয়েছিল জামসেদপুরে। কাউকে বলেনি বরেন বেশ কৌতুক লাগছিলো। দেখাই যাক্, এরকম একটা ভাব ছিল ওর। হোটেলে এসে রেণুর আত্মীয়রাই যোগাযোগ করেছিলো। বিকেলে জুবিলি পার্কে ওরা বেড়াতে আসবে, জামসেদজী টাটার স্ট্যাচুর নিচে বরেন অপেক্ষা করবে। আজকালকার মেয়ে, বিয়ের কথা চট করে বলা যায় না বলে এই ব্যবস্থা।

বরেন ইদানিং সাদা জামা আর স্যুট পরতো বাইরে গেলে। অফিসেও ওর এই পোশাক। কিন্তু সেদিন ধুতি পাঞ্জাবী পরলো। একটু লজ্জা লাগছিলো প্রথমটা, কিন্তু আয়নায় নিজেকে দেখে বেশ

একাশি

আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। ধুতি পাঞ্জাবীতে ওকে বেশ ভালই দেখায়। ঠিক পাঁচটার সময় জুবিলি পার্কে পৌঁছে গেল বরেন। বিষ্ণুপুর থেকে ট্যাক্সিতে সাকচি বেশী সময় লাগে না। তবু একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলো ও। জামসেদজী টাটার মূর্তির নিচে দাঁড়ালে পুরো জুবিলি পার্কটাকে চোখের সামনে ছবির মত মনে হয়। ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেছে পার্কটা। পাহাড় কেটে সুন্দর করে সাজানো গাছগুলো। এখন বিকেলে ফোয়ারাগুলো ছেড়ে দিয়েছে প্রতিটি ধাপে। অনেক নিচে রাস্তা, আর ওপাশে লেক। লেকের মধ্যিখানে একটা আকাশ-ছোঁওয়া ফোয়ারা। বরেন সিগারেট ধরিয়ে চারপাশে তাকালো। বেশ ভীড় হয়ে গেছে এখনই। সুধাময়ের নাম করে আজ যে ভদ্রলোক গিয়েছিলো তাকে দেখতে পেল না বরেন। খুব বাতাস দিচ্ছে, ধুতি সামলানো মুস্কিল। বরেন এক হাতে চুল ঠিক করলো। এমনিতে ওর চুল বেশ ফাঁপা সহজেই বাতাসে ওড়ে।

তারপর ওরা এসে গেল। বেশি লোক আসেনি বলে বরেন মনে মনে ধন্যবাদ দিল ওদের। সুধাময়ের আত্মীয় সেই ভদ্রলোক, শ্যামল না কি যেন নাম, সঙ্গে যে বিবাহিতা মহিলা, তিনি অবশ্যই ওর স্ত্রী, আর ওদের পেছনে, যে লম্বা এবং সুন্দর মেয়েটি যাকে দেখেই বোঝা যায় গভীরতা কাকে বলে ওরই সঙ্গে আজ আলাপ করতে হবে—বরেন মনে মনে খুশী হলো। আর তখনি ওর মনে হলো বয়সের তুলনায় মেয়েটি বড় গম্ভীর। আর সেজন্যেই নেহাৎ পুঁচকে মেয়ে বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটি যেভাবে ঘাড় সোজা করে হেঁটে আসছে, যেভাবে কী অবহেলায় দুপাশে তাকাচ্ছে—বরেন খুশী হলো। এই বয়েসে এসে একটি চটুল লঘু স্বভাবের মেয়েকে বিয়ে করলে নিজেরই ক্ষতি হতো হয়তো। বরং এই মেয়েটিকে দেখেই মনে হচ্ছে এর সঙ্গে কথা বলা যায়, কিন্তু ও এতো গম্ভীর কেন? এই বয়েসে?

আলাপ পরিচয় হলো। শ্যামল পরিচয় করিয়ে দিতেই রেণু

হাত তুলে নমস্কার করলো। বরেন লক্ষ্য করলো হঠাৎ রেণুর ভ্রূ একটু কুঁচকে উঠলো, ও চট করে শ্যামলের দিকে তাকালো। মেয়েটি এমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে কেন? কথা বলছিলো শ্যামলের স্ত্রীই বেশী। শ্যামল হুঁ হাঁ করছে। রেণু চুপ করে বসে আছে বেঞ্চিতে। একটু বাদে, যেমন হয় আর কি, শ্যামল পরিচিত একজনকে দেখতে পেয়ে উঠে গেল কথা বলতে। তখন সন্ধ্যে হবো হবো, পুরো জুবলী পার্কের আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। আলোগুলো জলের গা ঘেষে পায়ের নিচে। লাল নীল কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলো ঠিকরে বেরিয়ে এসে পার্কটাকে সুন্দর করে তুলেছে। শ্যামলের স্ত্রীই বললো, বাঃ, আপনারা চুপ করে আছেন যে, কথা বলুন।’

শ্যামলের স্ত্রী, দেখেই বোঝা যায়, ওর চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা যে-কোন বয়সের লাইসেন্স পেয়ে যায়। হাসলো বরেন, ‘আমি ঠিক এ রকম কথা বলতে অভ্যস্থ নই।’

বড় ঠোঁট কাটা মেয়ে শ্যামলের বউ। বলে বসলো, ‘প্রেম করেননি কখনো?’

বিরক্ত হতে গিয়ে হলো না বরেন, ‘সে রকম হলে তো আজ এখানে আসার দরকার হতো না। তাছাড়া উনি তো নিতান্তই ছেলেমানুষ।’

শ্যামলের বউ বললো, ‘আপনি ছেলেমানুষ বলেছেন, ও কিন্তু খুব রেগে যাচ্ছে। য়ুনিভার্সিটিতে ও দারুন পপুলার। দু-একজন তো পাগল হয়ে আছে ওকে প্রেম জানাবার জন্য। আপনার কেমন লাগছে?’

হাসলো বরেন, ‘ছেলেমানুষী ব্যাপার সব। তা য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে গেলে ও রকম কাফ্‌লাভ প্রত্যেকের একটু না আধটু থাকেই। এতে আমি কিছু মনে করার দেখি না। ওগুলো যারা আঁকড়ে থাকে, তারা, ঠকবেই।’ তারপর রেণুর দিকে তাকিয়ে বললো, ‘আপনি নিশ্চয়ই সেই দলে নন?’

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রেণু চোখ ঘুরিয়ে নিলো, তারপর বললো 'কি করে বুঝলেন।'

'আপনাকে আমার বুদ্ধিমতী বলে মনে হচ্ছে। আমি কি ভুল করছি?' বরেন হাসলো। রেণু কোন উত্তর দিলো না।

এরপর আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো ইতস্তত, তারপর শ্যামল ফিরে এলো। যাবার সময় একান্তে শ্যামল জিজ্ঞাসা করলো, ও হোটেলে দেখা করবে কি না। হেসে ফেলেছিলো বরেন। বলেছিলো তার কোন দরকার নেই। স্ত্রী হিসাবে রেণুকে পেলে ওর ভালো লাগবে। ওর পূর্ণ সম্মতি থাকলো।

হোটেলে ফিরে এসে বরেন ব্যাপারটা ভেবে খুশী হচ্ছিলো। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে মেয়েটি একটু স্বতন্ত্র ধবনের, আব চাপল্যের হালকা ব্যাপার ওর মধ্যে না থাকায় বরেনের মনে কোন দ্বিধা নেই। তবে বয়েসে ছোট, অন্তত বছর পনের তো হবেই। এটাকে যদি ঘাটতি বলা যায়, তবে সেটা ও মিটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু কথা হলো রেণু কি জানতো ওরা জুবিলী পার্কে আসছে বরেনের সঙ্গে দেখা করতে! যদি শ্যামলের পরিকল্পনা আগে থেকে না জানতো, তাহলে নিশ্চয়ই পার্কে বসে বুঝতে পেরেছে। বরেন ভাবতে চেষ্টা করলো তখন রেণুর ভাবভঙ্গী কেমন ছিলো? ও যদি অপছন্দ করতো ব্যাপারটা অথবা ওর যদি সম্মতি না থাকতো বরেনকে দেখার পর তবে কি ধরনের ব্যবহার করতো? নাঃ, এই ধরনের মেয়েকে দেখে মনের কথা বোঝা যায় না—সেটাই যা মুস্কিল।

কোলকাতায় ফিরে আসার পর সুধাময়কে বললো বরেন, ভালো লেগেছে। খবরটা বোধহয় সুধাময় পেয়ে গিয়েছিলেন আগেই, বললেন, 'কথাবার্তা হোক।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বরেন বললো, 'কথাবার্তার কোন দরকার নেই। আপনারা একটা দিন ঠিক করুন সেদিন আমার ভাই আর মা একবার দেখে আসবে। এই দেখা মানে পছন্দ করতে যাওয়া

নয়—আলাপ পরিচয় করে আসা। আর বিয়েটাও তাড়াতাড়ি সেরে নিলে ভালো হয়।'

নীরেনকে নিয়ে মা এক সোমবার দেখে এলেন। এমনিতে মা খুব কম কথা বলেন। রাত্রে ফিরে এলে বরেন জিজ্ঞাসা করলো, 'কেমন দেখলে?' মা প্রথমে কোন কথা বললো না। নীরেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখতে তো বেশ ভালই। তবে এত গম্ভীর হবে কেন এই বয়েসেই। তাছাড়া বাচ্চা হলে যা ভাবতাম য়ুনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েকে কেউ দেখতে এলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে—এটাও ভালো লাগলো না।'

মাথা নাড়লো বরেন, 'আহা, এ-বাড়ির বৌ হিসাবে কি মনে হলো?'

তোমার যখন পছন্দ হয়েছে, আমারও মত থাকলো। তবে আমরা তো শুধু ওকেই দেখলাম, ওর সম্পর্কে ওদের পরিবার সম্পর্কে তো কোন খোঁজখবর নেওয়া হয়নি, সেটা ভেবে ছাখ!'

'আঃ, আমি তো ওর পরিবারকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না। আর মেয়েটি যখন য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে, তখন শিক্ষিতা বলতেই হবে, দেখতেও সুন্দরী, হালকা টাইপের নয়। ব্যস্। আর খোঁজ খবর বলতে যদি বল অন্য কোন ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে কিনা বা কতখানি ছিলো, আমি তাতে কিছু মনে করি না। বিয়ের পর সে-সব না থাকলেই হলো। আমার মনে হয় সে-সব চুকে বুকে না গেলে আজকাল কেউ বিয়ে করে না।'

শেষ রাত্রে লগ্ন ছিলো। বিয়ের পর কোন কথা বলেনি রেণু। বাসর-ঘরের তো ব্যাপারই ছিলো না। বসতে না বসতেই ভোর হয়ে গেল। হাঁটুতে চিবুক রেখে রেণু বসেছিলো। কনের সাজে দেখতে দেখতে বরেনের মনে হয়েছে ওকে একটু বিশ্রাম নিতে বলা দরকার, খুব ধকল গেছে মেয়েটার ওপর দিয়ে।

কথাটা বলতেই রেণু উঠে দাঁড়ালো যেন এতটুকু শোনার জন্য ও অপেক্ষা করছিলো। রেণু ভিতরের ঘরে চলে যাওয়ার পর বরেনের

মনে হলো ঘরটা যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল। শেষ রাতের বাসর জাগায় ভীড় তেমন নেই, যারা ছিলো তারাও বোধহয় জেগে থাকতে আর পারছিলো না। বরেন মনে মনে ভীষণ হতাশ হলো, ও ভেবেছিলো বিশ্রাম করতে বললে রেণু নিশ্চয়ই এখানেই শুয়ে পড়বে। শোয়ার তো মোটামুটি ব্যবস্থাই করা আছে এখানে কিন্তু রেণুর ভঙ্গীতে মনে হলো ও যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেলো এ ঘর থেকে চলে যেতে পেরে।

বাসি বিয়েটা সকাল সকাল হয়ে যাওয়ার পর এই ছবিটা তোলা হয়েছিলো। ফটোগ্রাফার ছোকরাটা ওদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রেণুকে বলেছিলো আপনি ঘাড়টা অমন শক্ত করে দাঁড়াবেন না, হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটু, এদিকে তাকান, দেখুন তো, দাদা কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন। হ্যাঁ গুড, একটু হাসুন।' কিন্তু সেভাবে হাসেনি রেণু। এই বাঁধানো ছবিটায় রেণু তাকিয়ে আছে সামনে, ঠোঁট এমন কবে চেপে আছে, হাসছে কিনা বোঝা মুস্কিল।

আসলে রেণুর.এই হাসির মতো কোনো কিছুই বোঝা গেল না এ কয় বছরে। আর গতকাল রেণু চলে যাবার পর মা ওর দিকে তাকিয়েছিলেন, মুখে কিছু বলেন নি। এই সময় ধরে বাড়িতে এতকিছু কাণ্ড ঘটে গেল তবু মুখ খোলেন নি ওর কাছে। এখন মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা মানে নিজের অসহায়তাকে প্রকাশ করা—তা কখনো পারবে না বরেন।

মেয়েরা যেদিন বরের সঙ্গে বাড়ি থেকে টোপর মাথায় দিয়ে বেরিয়ে আসে সেদিন কেঁদে ভাসায়। ঐ কান্না তাকে মনে করিয়ে দেয় এতদিন যাকে নিজের বাড়ি বলে ভেবেছে সেটা আসলে বাপের বাড়ি। কান্নাটা এতই স্বাভাবিক বরেন তার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল কিন্তু ও অবাক হয়ে দেখলো রেণু এক ফোঁটা চোখের জল ফেললো না। শুধু ট্যাক্সীতে ওঠার সময় ওর দাদা দীপক এসে যখন ওর হাত রাখল তখন থরথর করে ওকে কেঁপে উঠতে দেখেছিলো বরেন। ব্যস ওই পর্যন্ত। খুব অবাক হয়েছিলো বরেন। তারপর ওর মনে

হয়েছিলো প্রিয়জন মারা গেলে অনেকে চেঁচিয়ে কাঁদে না. চোখের জল পড়ে না, গুম হয়ে বসে থাকে। সে দুঃখটা নাকি ভয়ানক। লোকে বলে কাঁদলে বেঁচে যেতো। রেণুরও কি সেই রকম ব্যাপার? তবে এ কি রকম দুঃখ?

ফুলশয্যার খাওয়া দাওয়া চুকতে রাত হয়ে গিয়েছিলো। বরেনের দুই বোন যারা বিয়ের পর বাইরে থাকে, এসেছিল বিয়েতে। বৌ দেখে তারাও খুশী। তবে ছোট বোন এসে বলেছিলো. 'দাদা বৌদি বড় গম্ভীর।' সেই বোনেরাই সাজগোজের ভার নিয়েছিলো। এই ঘরই ছিলো ফুলশয্যার ঘর। ফুলটুল এনে খুব বাড়াবাড়ি করছিলো ওরা। বরেন এতটা পছন্দ করেনি। ওর মনে হচ্ছিলো রেণুরও এসব পছন্দ হবে না। রাত্রিতে সবাই যখন বিশ্রাম নেবার উদ্যোগ করছে তখন বরেন ঘরে এলো। ওদের বাড়িতে ফুলশয্যার রাত্রে আড়িপাতার কথা কেউ চিন্তাও করবে না এটা বরেন জানে। দরজা বন্ধ করে দেখলো রেণু জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন ওর মাথায় ঘোমটা নেই, খসে যাওয়া আঁচলটা কাঁধের ওপর আলতো করে পড়ে আছে। লাল বেনারসীতে ওকে খুব ভাল লাগলো বরেনের। আজ অবধি কোন মেয়ের, যুবতী মেয়ের শরীর স্পর্শ করেনি ও সচেতনভাবে। এবং এতদিন পরে এই ফুলশয্যায় রাত্রে রেণুকে, নিজের বৌকে পেছন থেকে দেখে ও হঠাৎ একটা নতুন ধবনের উত্তেজনা আবিষ্কার করলো।

কাছে গিয়ে বরেন রেণুর কাঁধে হাত রাখতেই ঘুরে দাঁড়ালো রেণু। শুকনো চোখের দিকে তাকালে বুকের মধ্যে কেমন শিরশিরানি হয়। সেইরকম চোখে রেণু ওকে দেখলো, 'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'বলো।' হাসতে চেষ্টা করলো বরেন। আচ্ছা বিয়ের, মানে ফুলশয্যার কতদিন বা কতক্ষণ পর্যন্ত মেয়েরা আপনি চালিয়ে যায়?

'কথাটা আপনাকে শুনতে হবে।' রেণুর গলা শক্ত। 'অবশ্যই শুনবো। তুমি খাটের ওপর এসে বসো।' বরেন হাত বাড়িয়ে

ওকে ধরতে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে দাঁড়ালো রেণু, 'কথাটা এটাই। আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন না।'

'কি বলছো?' চমকে উঠলো বরেন।

'আমি না বোঝার মত কিছু বলছি না।'

'কিন্তু কেন? তুমি এখন আমার স্ত্রী।'

'স্ত্রী বলেই তার শরীরটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার সব অধিকার পেয়ে গেছেন, তাই না? অবশ্য ঠিকই, এই বয়েসে যখন আমার মত একটা মেয়েকে বিয়ে করেছেন তখন প্রথমে এটাই চাইবেন।'

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না বরেন। রেণু কি বলতে চাইছে? বিয়ের পর ওর বন্ধু বান্ধবরা অনেকে স্ত্রী সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। অপরিচিতা মেয়ে স্ত্রী হবার ছাড়পত্র পেয়ে বিয়ের রাত্রেই শরীরের স্বাদ দিয়েছে অনেককে, আবার কাউকে কাউকে অপেক্ষা করতে হয়েছে সপ্তাহখানেক। আগে মনের সায় আসুক তারপর শরীর। রেণুও কি তাই বলতে চাইছে? কিন্তু কথা বলার ভঙ্গী এরকম কেন?

'ঠিক আছে', বরেন বললো, 'এখনি তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ ঘটেনি। সত্যি তুমি নেহাৎই ছেলেমানুষ।'

'আপনি যা খুশী বলতে পারেন। তবে আমার কথা হলো, আপনি অযথা আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করবেন না। আর আপনার সঙ্গে ঐ বিছানায় শুতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমার জন্যে যদি আলাদা খাট করে দিতে পারেন তো ভালো নইলে আমি মেঝেতেই শোব।' হিস্টিরিয়া রোগীর মত কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলো রেণু।

'কেন?' অনেকক্ষণ পরে বললো বরেন। ছোট্ট শব্দটা ঘরের মধ্যে একবার ঘুরপাক খেয়ে মিলিয়ে গেলেই রেণু মাথা তুললো, 'আপনার চাকরী, অর্থ, ব্যক্তিত্ব এসব পুঁজি করে আপনি সহজেই আমাকে বিয়ে করতে পেরেছেন। কিন্তু মনের দিক থেকে আপনাকে আমি নিতে পারছিনা, তাই।'

‘অর্থাৎ আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তোমার সম্মতি ছিলো না।’ বরেন ওকে দেখছিলো। জানলার দিকে সরে গেলো রেণু। মাথা নেড়ে না বললো।

‘তাহলে বিয়ে করলে কেন? কেন প্রতিবাদ করোনি?’

এখান থেকে রেণুর চওড়া পিঠ, ঘোমটা নেমে যাওয়া সুন্দর করে বাঁধা খোঁপা বরেন দেখতে পাচ্ছে। ক্রমশ একটা অপমান-বোধ, একটা জ্বালা বরেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিলো। প্রশ্নটা করার সময় নিজের অজান্তেই গলাটা জোরে হয়ে গেছে। এখন নিজের কাছেই নিজেকে অসহায় বলে মনে হলো।

রেণু কোন উত্তর দিলো না। ওর পিঠ তির তির করে কাঁপছে, মাথাটা সামনের দিকে ঈষৎ নামানো। বরেন আবার বললো, ‘জামসেদপুরে যখন তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তখন আপত্তি করোনি কেন? কেন আমার সামনে ভালোমানুষ সেজে বসেছিলে?’

মুখ না ফিরিয়ে এবার রেণু বললো, ‘আমার আপত্তির কোন দাম ছিলো না। কেউ শুনতে চায়নি।’

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় যেন রক্ত উঠে এলো বরেনের। কোন কথা না বলে রেণুর পাশে এসে দাঁড়ালো, ‘তুমি এরকম নাটক করছো কেন?’

বরেনের শরীর ওর পাশেই এটা বুঝতে পেরেই যেন রেণু সরে দাঁড়াতে চাইলো। ‘আর কেউ না শুনতে চাক জামসেদপুরেই তুমি আমাকে বলতে পারতে তুমি বিয়ে করতে চাও না। এখন, আমাকে তুমি যে কথা বলছো তা নেহাতই হয় ছেলেমানুষী নয় ন্যাকামো। আমি এসব একদম সহ্য করতে পারি না রেণু।’

‘আমি যা সত্যি তাই বললাম। আপনি যা ইচ্ছে ভাবতে পারেন।’ রেণুর কথাটা শেষ না হতে হতেই বরেন দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলো, ‘অনেক হয়েছে, আর পারছি না আমি, একটা মানুষ তার ফুলশয্যার রাতে এভাবে সহ্যশক্তির পরিচয় দিতে পারে না,

তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো রেণু?' রেণুর শরীর নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে বরেন হঠাৎ কেমন নিজেকে সুখী সুখী ভাবতে চাইছিলো। এইসব কথা, রেণুর এই আচরণ নেহাতই অভিনয় এই রকম একটা কল্পনা ও করতে চাইছিলো। কিন্তু ততক্ষণে রেণু সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে নিজেকে আলাদা করার চেষ্টা করছে। বরেনের গলার কাছে ওর চিবুক বার বার ঘষে যাচ্ছে, দুহাতে বরেনের কাঁধ ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে ও। শেষ পর্যন্ত প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলো রেণু, 'ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন আমাকে, ইতর, অসভ্য, কামুক।'

সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক শক লাগলো শরীরে, বরেনের হাত শিথিল হয়ে গেলো। আর রেণু দৌড়ে একবার বন্ধ দরজার দিকে গিয়ে কি ভেবে ফিরে এসে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল বরেন, আচমকা ওর কোন চিন্তা কাজ করছিলো না। চোখের পাতা না ফেলে ও রেণুর ছুটে যাওয়া দেখলো। খাটের ওপর রেণুর শরীর কাঁপছে, খাটের ওপাশে বিয়েতে পাওয়া বড় সাজ-গোজের আয়না। বরেন হঠাৎ দেখলো আয়নাতে রেণুর মুখের একটা দিক, যা কান্নায় কাঁপছে, দেখা যাচ্ছে। আর তার পেছনে একটু দূরে দাঁড়ানো বরেন। নিজের দিকে তাকিয়ে ও চমকে উঠলো, অনেক বয়স বেড়ে গেছে যেন হঠাৎই, গিলে করা পাঞ্জাবী ধুতি পরা সত্ত্বেও ওকে কি কামুক কামুক দেখাচ্ছে?

আর তারপরই বরেনের খেয়াল হল অস্বাভাবিক চুপচাপ হয়ে গেছে বাড়িটা। এতক্ষণ যাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিলো তারাও যেন চুপ করে গেছে হঠাৎই। রেণুব চিৎকার নিঃসন্দেহেই সমস্ত বাড়িময় ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই শুনেছে কথাগুলো, কাটা কাটা বিষাক্ত শব্দ। এখনি হয়ত দরজায় শব্দ হবে, কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করবে সবাই। ফুলশয্যার রাত্রে নতুন বৌ যদি এইসব শব্দ ব্যবহার করে চিৎকার করে ওঠে তাহলে লোকে সহজেই ভাববে বলাৎকার

করতে গিয়েছিলো। রেণুও কি তাই ভেবেছে? নীরেন, মা এখনই এসে পড়বে। বোধহয় মা এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলবেন, 'খোকা?' লজ্জায় ঘেন্নায় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো বরেন। তারপর দুহাতে মাথা চেপে ধরে ফিস ফিস করে বললো, 'এ তুমি কি করলে রেণু এ তুমি কি করলে, ছিঃ।'

কিন্তু কেউ এসে দরজায় ধাক্কা দিলো না। বিয়ে বাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই ঘরটাকে যেন সবাই এড়িয়ে গেল এখন। কারোর পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎই কোন মন্ত্রে যেন সমস্ত বাড়িটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

চুপচাপ জানলায় ফিরে গেলো বরেন। এখন অনেক রাত। রাস্তায় লোকজন নেই। এপাশের দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় যাওয়া যায়। বরেনের ইচ্ছে হলো একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় গিয়ে বসে। কিন্তু ওখানেও লোকজন শুয়ে বসে থাকতে পারে। কারোর সঙ্গে মুখোমুখি এখন দেখা হওয়া—বরেন চেয়ার টেনে নিলো। সমস্ত বাড়িটাই যে বিয়েবাড়ি হয়ে আছে!

স্ত্রীর দিকে তাকালো ও। রেণুকে স্ত্রী ভাবতে এখন অস্বস্তি হচ্ছে কেন? ও কি করবে? রেণুর সঙ্গে সম্পর্কটা কিভাবে চলবে? ওর মাথায় কিছুতেই ঢুকছিলো না ও এ রকম কেন করলো। আজকের যুগে কোন মেয়েকে নিশ্চয়ই জোর করে বিয়ে দেওয়া যায় না। রেণু যদি কোন ছেলেকে ভালবাসে তাহলে কেন ওকে বিয়ে করবে? আর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া মানে সেই ছেলেটির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে আসা। তাহলে তো এখন বিয়ের পরেই স্ত্রী হিসেবে নিজের সম্মান আঁকড়ে ধরতে চাইবে ও। সেরকম যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে বরেন স্বচ্ছন্দে ওকে ক্ষমা করতে পারে। রেণু যদি বলে আমি কাউকে ভালোবাসতাম, বরেন সেটা হেসে মেনে নিতে পারে। কিন্তু এই আচরণের অর্থ নিশ্চয়ই সেই ভালোবাসার মানুষকে ও ভুলতে পারছে না। এতো স্পষ্ট করে নিজেদের সম্পর্কটা যে ভেঙ্গে ফেললো রেণু তার পেছনে

নিশ্চয়ই সেই ছেলেটি রয়েছে। স্বামীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক না রেখে চললে কি ছেলেটি ওকে কোনকিছুর আশা দিয়েছে? না নেহাতই প্রতিবাদ এটা, নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়া, দ্যাখো তোমাকে বিয়ে করতে পারিনি বলে আমি নিজেকেও বঞ্চিত করলাম। কিন্তু ছেলেটি কে? য়ুনিভার্সিটিতে পড়া চালচুলো নেই এমন কোন বাচ্চা ছেলে?

রেণু এখন উঠে বসেছে। আধো ভাঁজ হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বসে আছে চুপচাপ। কি মনে হতে উঠে দাঁড়িয়ে বরেন বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে বেড স্যুইচ জ্বেলে দিলো।

হঠাৎ রেণু মুখ তুললো, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন?'

বরেন চট করে কোন কথা বলতে পারলো না। ওর ইচ্ছে হলো বলে চমৎকার, চমৎকার, এবার কি আমাকে হাঁততালি দিতে বলো। কিন্তু ও কোন কথা বললো না।

রেণু আবার বললো, 'আপনি যদি চান বাইরের লোকের কাছে আমি আপনার স্ত্রীর মত ব্যবহার করবো। শুধু পাঁচ বছর আপনি আমার শরীরের দিকে তাকাবেন না। এই অনুরোধটুকু রাখুন।'

হঠাৎ বরেন বলে উঠলো, পাঁচ বছর পর আমার বয়েস কতো হবে জানো? আর পাঁচ বছরের কথা উঠছে কেন?'

রেণু বললো, আমি উত্তর দিতে পারবো না।'

'তুমি আমার জীবন নষ্ট করে দিচ্ছো, এটা বুঝতে পারছো না।' বরেন খুব অসহায়ের মত কথা বললো, 'তুমি বুঝতে পারছে না আমি কোন অন্যায় করিনি, তবু আমাকে এটা চাপিয়ে দিচ্ছো?

মাথা নাড়লো রেণু, 'আমার কিছু করার নেই এখন।'

'ছেলেটি কে?' আস্তে আস্তে শব্দদুটো উচ্চারণ করলো বরেন।

এই প্রশ্নটাই আশঙ্কা করছিলো যেন রেণু এতোক্ষণ, চট করে মাথা নাড়লো, আমি জানি না।

'কি করে সে?' বরেন আবার জিজ্ঞাসা করলো।

'বলতে পারবো না।' রেণু চোখ বন্ধ করলো।

‘কাছে এলো বরেন, এমন একটা ছেলের জন্য তুমি নিজের জীবন, আমার জীবন নষ্ট করছো যার কোন মেরুদণ্ড নেই, সামান্য ক্ষমতা নেই তোমাকে ধরে রাখার ? যাকে তুমি ভালবেসেছ ভেবে এতে কাণ্ড করছো সে যে কত বড় অপদার্থ সেটা বুঝতে পারছো না ?’

রেণু বললো, ‘আপনি চুপ করুন, আমি কোন উত্তর দিতে পারবো না।’

মরীয়া হয়ে গেলো বরেন, তোমাকে বলতেই হবে ছেলেটি কে ?’

‘আমি বলবো না ?’ চাপা গলায় বললো রেণু।

‘বলতে তোমাকে হবেই, আমি ছাড়বো না।’ রেণুর দুটো কাঁধ দশ আঙ্গুলে আঁকড়ে ধরলো বরেন, ‘কোথায় থাকে সে ?’

আমি জানি না।’ দাঁতে দাঁত চাপলো রেণু।

‘আমি তোমাকে আজ ছাড়বো না, তুমি আমার জীবন নষ্ট করে দিতে চাইছো, ছেলেটির নাম বলো ?’ থর থর করে কাঁপছিলো বরেন। ওর হাত ক্রমশ বসে যাচ্ছে রেণুর পিঠে, গলায়। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় রেণু ছটফট করছিলো। তারপর কী ভীষণ জেদে বলে গেলো, ‘আপনি আমাকে মারুন, ধরুন যা ইচ্ছে করুন, আমি কিছুই বলতে পারবো না।’ আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তে হাত উঠে গেলো বরেনের, রেণুর সরে যাওয়া মুখে প্রচণ্ড জোরে চড় মারলো ও। দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো রেণু ‘আপনি আমাকে মারুন, মারুন, মারুন।’

মুখে কেউ কিছু বললো না, কিন্তু বরেন বুঝলো সবাই ওকে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে মুখিয়ে আছে। পরদিন সকালেই সব আত্মীয়স্বজন চলে গেলো। ছুটি নিয়েছিল ও দিন সাতেকের, বাতিল করে অফিসে চলে গেলো ও। মা কিছু বললেন না, নীরেন দুবার ওর দিকে তাকালো। রেণু নিজের ঘরেই রয়েছে। বরেন লক্ষ্য করলো নীরেন বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে গেলো না। অথচ কাল সন্ধ্যেবেলায় নীরেনকে রেণুর সঙ্গে খুশী হয়ে কথা বলতে দেখেছে।

দুপুরে সুধাময় এলেন ওর ঘরে। কাজে মন বসছে না, অফিস-শুদ্ধ লোক অবাক। এমন কাজ-পাগলা লোক দেখা যায় না—এমন ভাব সবার চোখে। সুধাময় ঘরে ঢুকে বললেন, 'কি ব্যাপার ছুটি ক্যানসেল করলেন যে!'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে জ্বলুনি শুরু হয়ে গেলো বরেনের। এই লোকটাই সব কিছুর জন্য দায়ী। ও যদি খবর না দিতো, ঘটকালি না করতো তবে আজ ওকে এভাবে—। বরেন বললো, 'দরকার হলো না।'

'বাড়ির সবাই কি বলছে, বৌ কেমন হয়েছে?' সুধাময় হাসলেন।

মন ঠিক করে ফেললো বরেন। এ ধরনের ন্যাকামি আর ভালো লাগছে না, আপনি কিছু জানতেন না?'

'কি?' সুধাময় বরেনের বলার ধরনটা বুঝতে পারছিলেন না।

সামলে নিল বরেন, 'কিছু না।'

'কি ব্যাপার বলুন তো! কোন গোলমাল হয়েছে নাকি? বিয়ের দিন তো কিছু মনে হয়নি। কাল তো দেখলাম বেশ। কি হয়েছে?' সুধাময় কৌতূহলী হলেন।

'আপাতত আমি কিছু বলতে পারছি না। তবে ওদের বলে দেবেন দ্বিরাগমন না কি সব ফর্মালিটিস আছে, সেগুলোর কোন দরকার নেই।' বরেন ফাইল টেনে নিলো। সুধাময় কি ভাবলেন খানিক, 'রেণু তো ভালোই মেয়ে। অবশ্য আমার সঙ্গে যোগাযোগটা অনেক দূরের, তবু। আমাকে যদি খুলে বলেন—।'

মাথা নাড়লো বরেন, 'কিছুই বলার নেই।'

সত্যি আর কিছু বলার থাকলো না বরেনের। পরপর কদিনে একই ব্যাপার। সেই কান্নাকাটি, কথা-কাটাকাটি, রেণু মাটিতে শুয়ে পড়লো। বাড়িতে ফিরতেই এখন খারাপ লাগছে। মনের মধ্যে রেণুর সেই ছেলেটি বার বার এসে যাচ্ছে। কি করে খোঁজ পাওয়া যায়? শেষ পর্যন্ত এক রাত্রে ও ক্ষেপে গেলো খুব।

রেণুকে জোর করে ভোগ করার একটা ইচ্ছে, ওর সমস্ত সত্তাকে গুড়ো করে দেবার বাসনায় ও বলপ্রয়োগ করলো। প্রাণপনে চেঁচালো রেণু, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল, বরেনের গাল থেকে ওর নখের আঁচড়ে রক্ত বেরিয়ে এল। এমন সময় মা দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

এতোদিন যা ছিল ঢাকাঢাকি এখন তা দিনের মত পরিষ্কার বাড়ির সবাইয়ের কাছে। মা-ই আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করলেন, মুখে কিছু বললেন না! নীরেন রেণুকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। দীপক নিতে এসেছিল রেণুকে। সুধাময় খবর দিয়েছিলেন বরেনের কথা শুনে: দ্বিরাগমন বাতিল করে দিল বরেন। দীপককে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলো, 'এসব ঘটনা চেপে বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন কেন?

মুখ নিচু করেছিল দীপক, উত্তর দেয়নি।

ক্ষেপে গিয়েছিল বরেন, 'উত্তর দিচ্ছেন না কেন? ছেলেটার নাম কি?'

'কি হবে এসব ভেবে।' দীপক বলেছিলো, 'ছোটখাটো ভুল যদি কেউ করে থাকে ক্ষমা করে নিন না।'

'ছোটখাটো ভুল? আপনার বোন আমার জীবন শেষ করে দিচ্ছে আর আপনি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন?

ঘাড় নেড়েছিলো দীপক, 'আমি সত্যি ওর সব কথা জানি না।'

রেণুকে পাঠায়নি বরেন। দীপককে বলে দিয়েছিল, নিয়ে যেতে পারেন তবে আর ফিরিয়ে দেবার দরকার নেই। রেণু কিছু বলার আগেই দীপক চলে গিয়েছিলো। কড়া হুকুম দিলো বরেন, রেণু বাড়ির বাইরে যাবে না, কাউকে কোন চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারবে না। বাড়ির টেলিফোনে তালাচাবি দিয়ে দিলো ও। রেণুকে বললো, 'ফোন এলে তোমার ধরার দরকার নেই, মনে রেখো।'

প্রচণ্ড জ্বালায় কথাগুলো বলেছিলো বরেন। স্তব্ধ করার জন্য

মরীয়া হয়ে উঠেছিলো। বাড়িতে বন্দী হয়ে থাক এখন। ব্যাপারটা যেন মেনে নিয়েছিল রেণু। বরেনের সবকটা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে সে। বাপের বাড়িতে যাবার ইচ্ছা একবারও প্রকাশ করেনি। ওর দাদা দুবার এসে ফিরে গেছে। রেণুই আর যেতে চায়নি। বরেনের তো সাফ কথা বলা আছে, দীপক তাই জোর করতে সাহস করেনি। অনেক রাত অবধি অফিসে কাটিয়ে বরেন যখন বাড়ি ফিরতো তখন রেণু বলে যে একটা মেয়ে ওদের বাড়িতে আছে তা ভুলে যেতে চাইতো। কথাবার্তা তো এমনিতেই বন্ধ। ওর জন্য যে ঘরটা দেওয়া হয়েছে সেখানেই থাকে সারাদিন। দুই আলমারী বই নিয়ে দিন কাটাতো প্রথম প্রথম, এখন সম্ভবত ঝি-কে দিয়ে পাড়ার লাইব্রেরী থেকে বই আনায়।

যে ছেলেটির জন্য ওর এতো জেদ তাকে খুজে বের করতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়েছে বরেনের। কিন্তু নিজের কথা, পাঁচ রকম নতুন সমস্যার কথা ভেবে এই ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছে ও। যেমন চলছে তেমন চলুক। বাকী জীবনটা এইভাবেই দিব্যি কেটে যাবে। মিছিমিছি কাদা ছুঁড়ে কি লাভ। মাসের পর মাস এইভাবে কেটে গেলো চুপ চাপ। শেষ পর্যন্ত একদিন ঘটে গেলো ব্যাপারটা। যেন এইটে ঘটাবার জন্য রেণু এতোদিন সব মেনে নিয়েছিলো।

দুপুরবেলা, বাড়িটা যখন ফাঁকা, কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো রেণু। মা তখন নিজের ঘরে শুয়ে আছে। ঝি-কে দরজা বন্ধ করতে বলে নিচে নেমে এসেছিলো ও। ব্যাপারটা নীরেন ওকে বলেছিলো বিস্তারিতভাবে।

পাড়ার চা-য়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতে নীরেন অবাক হয়ে দেখেছিলো, রেণু হেঁটে যাচ্ছে, একা। সেই রাত্রের ঘটনার পর ও রেণুকে আর বৌদি বলে ডাকে না। কথাই বলে না। বাড়িতে কিছু হলেও চিৎকার করে বলতো, দাদার-বৌ'। ইদানিং অবশ্য তাও বলছে না।

রেণুকে দেখে ও উঠে দাঁড়ালো তড়াক করে। একবার ভাবলো সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে, দাদা নিষেধ করা সত্ত্বেও কোন সাহসে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? তেমন দরকার হলে ও রেণুকে হাত ধরে হিড় হিড় করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই মেয়েছেলেটার ওপর ওর কোন দরদ নেই। একজনের সঙ্গে পিরীত করে ওদের বাড়িতে এসে সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওর নিজের বৌ হলে দুবেলা প্যাঁদাতো মেয়েছেলেটাকে। কদিন পুরনো পিরীত আঁকড়ে থাকে দেখা যেত তাহলে।

পায়ে পায়ে এগোচ্ছিল নীবেন, হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই থমকে দাঁড়াল। রেণু ওকে দেখতে পায়নি এখনো। মাথায় ঘোমটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাস স্ট্যাণ্ডেব দিকে। কোথায় যাচ্ছে ও? এক, বাপের বাড়ি যেতে পারে নয় সেই প্রেমিকের কাছে। একদম হাতেনাতে ধরা যেতে পারে যদি দ্বিতীয়টা হয়।

খানিক দূরত্ব রেখে নীরেন হাঁটতে লাগলো। বাস স্ট্যাণ্ডে এসে বেণু মাথার ঘোমটা খুলে ব্যাগ থেকে একটা কালো চশমা বের করে চোখে এঁটে নিলো। নীরেন রিক্সা স্ট্যাণ্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে, ও দেখলো রেণু ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখছে। এখন দুপুরবেলা। তাই স্ট্যাণ্ডে লোকজন কম। আর এই সময়টায় বাসও কম চলাচল করে। দূরে কোন বাস দেখতে পেলো না নীবেন। পাশেই একটা ওষুধের দোকান। নীরেন চট করে ভিতরে ঢুকে গেলো। এখান থেকে রেণুকে দেখা যাচ্ছে। দোকানদার চেনাশোনা, আট আনা পয়সা দিয়ে নীরেন বরেনের অফিসে ফোন করলো। নীরেনের গলা শুনে বরেন অবাক হলো, 'কিরে কি ব্যাপার!'

'তুমি এখনই বাড়ি চলে এসো।' নীরেন তাড়াতাড়ি করছিলো।

'কি হয়েছে?' বরেন বুঝতে পারছিলো না।

'উনি বেরিয়েছেন একা একা। বোধহয় কারোর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আমি সঙ্গে যাচ্ছি বুঝতে পারছেন না, ঐ যে বাস

আসছে, তুমি এখনি এসো, ছাড়ছি।' উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বলে নীরেন ফোনটা ছেড়ে দিলো।

রেণু ততক্ষণে বাসে উঠে পড়েছে, প্রথম দরজা দিয়ে। প্রায় চলন্ত বাসের দ্বিতীয় দরজায় উঠে পড়লো নীরেন। ভাগ্যিস বাসটায় বেশ ভীড়, রেণুব চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। দরজার কাছে সেঁটে থেকে নীরেন রাস্তা দেখতে লাগলো। কণ্ডাক্টার টিকিট চাইলে একটু মুস্কিলে পড়ে গেলো, একদম ধর্মতলার টিকিট কাটলো ও। এর মধ্যেই রেণুকে নামতে হবে নিশ্চয়। প্রত্যেকটা স্টপেজে বাস দাঁড়ালে ও ঝুঁকে পড়ে দেখছিলো রেণু নামছে কিনা। মহাজাতিসদনের কাছে বাস থামতেই শেষপর্যন্ত রেণুকে নামতে দেখলো। এদিকে ওর বাপের বাড়ি নয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেই কেষ্ট ঠাকুরের কাছেই যাচ্ছে। তড়াক করে লাফিয়ে নামলো নীরেন। বাসটা চলে যেতেই বিব্রত হয়ে পড়লো ও। এখানে কোন আড়াল নেই। যদিও রেণু সামনে হাঁটছে তবু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেই ওকে দেখতে পেয়ে যাবে। পেলে আর কি হবে, এগিয়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে হবে এই যা। তার মানে কেষ্ট ঠাকুরকে আর ধরা যাবে না। দূরত্বটা বাড়াতে লাগলো নীরেন। তারপর হঠাৎ ও চমকে দেখলো হাত বাড়িয়ে রেণু একটা ট্যাক্সী থামালো। ব্যাপারটা বুঝবার আগেই রেণু ট্যাক্সীতে উঠে বসেছে। দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরবে ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সীটা চলে গেলো বাঁদিকে। হতাশ চোখে ব্যাপারটা দেখল নীরেন। ওর পকেটে বেশি টাকা নেই এখন, ট্যাক্সীতে চেপে ফলো করা অসম্ভব। রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে নীরেন ঠোঁট কামড়াতে লাগলো।

দরজা খুলে বরেন দেখলো রেণু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ও যে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসবে বোধহয় ভাবতে পারেনি রেণু। বরেন দেখলো রেণুর মুখে গলায় ঘাম, যদিও এখন ভয় পেয়েছে তবু চোখ দুটোতে কেয়ার করি না ভাব। আজ দুপুরে নীরেনের ফোন পেয়ে প্রথমে ভাই-এর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত,

হয়েছিলো ও। মনে হয়েছিলো নীরেন যেন বেশী রকমের বাড়াবাড়ি করছে। ও ভুলে গিয়েছে বরেনের থেকে বয়েসে ও অনেক ছোট এবং রেণু বরেনের স্ত্রী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলো, নীরেন যেটা করেছে সেটা অল্পবয়সী উত্তেজনায় করেছে কিন্তু রেণু কেন যাবে তার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও। খানিক আগে নীরেন ফিরে এসেছে। রেণু নাকি টের পেয়েছিলো যে নীরেন ওকে ফলো করেছে তাই পাকা ক্রিমিনালের মতো নীরেনকে এড়াতে চট করে বাস থেকে নেমে ট্যাক্সী ধরেছিলো। এটা থেকেই বোঝা যায় রেণু এমন কোন কাজ করতে যাচ্ছিলো যা সে চাইছিলো না নীরেন বা আর কেউ জানুক। আর এই সময় বরেনের চোখে পড়লো রেণুর হাতে শাঁখা নেই। প্রথম যখন বাড়িতে এলো তখন মা ওর সামনে রেণুকে বলেছিলেন, 'আজকাল তো মেয়েরা শাঁখা পরতে চায় না দেখছি, কিন্তু তুমি তা করো না। এটা একটা গয়নার মতো, দেখতেও বেশ লাগে। তাছাড়া এবাড়ির এটাই নিয়ম।'

মাথা গরম হয়ে গেল বরেনের। এতক্ষণ ভেবেছিলো খুব ভদ্রভাবে মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে রেণুর সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু হাতের ওপর চোখ রেখে ও চিৎকার করে উঠলো, 'কোথায় গিয়েছিলে ?'

এখন বিকেল। আশেপাশের ফ্ল্যাট বাড়ির বারান্দায় মেয়েরা বাচ্চারা বসে আছে। রেণু তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে, মাথাটা নিচু করলো।

'আমি জানতে চাই কোথায় গিয়েছিলে ?' বরেন আবার বললো, 'তোমাকে আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি বেরোও' এতো সাহস !'

রেণু কোন কথা বললো না। যেন ওর কানে কোন কথাই ঢুকছে না। বরেন দেখলো পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েরা কৌতুহলী হয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। রাগে ওর শরীর জ্বলে গেলো, হাত বাড়িয়ে ও রেণুকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এসে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। রেণুর হাত এখনো বরেনের মুঠোর মধ্যে ধরা, কোথায় গিয়েছিলে ?' চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করলো বরেন।

অবাক হয়ে তাকালো রেণু, যেন বরেনের এই গলার স্বরে ওকে বুঝতে পারছে না।

'কাজ ছিলো।' শেষ পর্যন্ত রেণু বললো।

'কি কাজ?'

'ব্যাক্তিগত।'

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের উল্টোপিঠে চড় মারলো বরেন। সটান গিয়ে গালে লাগলো হাতটা, ছিটকে পড়তে গিয়ে রেণু পড়লো না, ওর হাত তখনো বরেনের ডান হাতের মুঠোয় ধরা।

'তুমি আমার স্ত্রী। তোমার ব্যাক্তিগত ব্যাপার কিছু থাকতে পারে না। যাব কাছে গিয়েছিলে তার নাম বলো।'

অদ্ভুতভাবে হাসলো রেণু, 'আমি অক্ষম। নিজের স্ত্রী পরিচয় দিয়ে দাবী জানাচ্ছেন আবার হাত তুলতেও পারছেন তার গায়ে, বাঃ।'

রেণুর এই হাসিটা আরো জ্বালা ধরিয়ে দিল ওর মনে। এলোপাথারি চড় মারতে লাগল ও, 'তোমার মত বেশ্যার গায়ে হাত তুললে কোন অপরাধ হয় না, এটা জেনে রাখো, রাখো রাখো।'

শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো রেণু। কান্না মেশানো 'ও মাগো' শব্দ দুটো বোধ হয় আশে পাশের সব ফ্ল্যাটেই পৌঁছে গেলো। হাঁপিয়ে পড়েছিলো বরেন, চেয়ে দেখলো মা দরজায় দাঁড়িয়ে। বরেন তাকালো মায়ের দিকে। রেণু হাঁটু গেড়ে বসে আছে। পাশেই মেঝেতে ওর ব্যাগ পড়ে। ব্যাগের মুখটা খোলা। চুলের কাঁটা, পাউডারের কৌটো, একটা ছোট্ট পার্স আর দুটো শাদা শাঁখা বেরিয়ে এসেছে ব্যাগ থেকে। নিচু হয়ে শাঁখা দুটো তুলে নিলো বরেন, 'এগুলো হাতে পরে যাওনি কেন? তার সেন্টিমেন্টে লাগবে বলে?'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো রেণু। চোখ তুলে শাঁখা দুটো দেখে মাথা নিচু করলো আবার, 'আপনার মাকে অসম্মান করা হতো।'

পাগলের মত বলে ফেললো বরেন, ছাখো মা ছাখো, তোমাদের বাড়ির বৌ তোমাকে কত সম্মান করে! তার মানে তুমি স্বীকার করছো তুমি সেই ছেলেটির কাছে গিয়েছিলে! বলতে বলতে আবার ছুটে যাচ্ছিলো বরেন রেণুর দিকে, হঠাৎ মায়ের গলা শুনে থমকে দাঁড়ালো ও। মা বললেন 'খোকা!' শব্দটার মধ্যে এমন কিছু ছিলো বরেন মুখ ফিরিয়ে তাকালো, কিন্তু ততক্ষণে মা ভিতরে চলে যাচ্ছেন আবার। মায়ের এই উপস্থিতি, কিছু না বলে সব দেখা, তারপর ওর নাম ধরে চাপা ডাক—বরেন কেমন অসহায়ের মত শূন্য দরজার দিকে তাকালো। তারপর কোন কথা না বলে ও নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলো। ভিতরের বারান্দায় নারেন দাঁড়িয়ে আছে তখন, বরেন দেখলো নীরেনের মুখটা বেশ তৃপ্ত। চিৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছিলো বরেন ভাইকে, তারপর হঠাৎই নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলো। ওর মনে হলো এখন আর কিছু করার নেই, কিছু না।

এখন রেণুকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যায়। বলে দেওয়া যায় ওকে আর দরকার নেই। কিন্তু তাতেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? আজ যদি পাঠিয়ে দেবার পরে রেণু বলে ওর পেটে সন্তান এসেছে আর তার পিতা বরেন তাহলে ও কি করবে? যার জন্যে রেণু মুখ বুঁজে মার খাচ্ছে, নিজের এবং বরেনের ভবিষ্যৎ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে বাধছে না তার জন্য এবং তার সঙ্গে রেণু যা খুশী তাই করতে পারে। আর বাপের বাড়ি যাবার পব তো ও পুরোন প্রেম নতুন করার অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। এবং হয়তো বলা যায় না, তার ফলভোগ করতে হবে বরেনকে! আর এক হয় বিচ্ছেদের জন্য আদালতে যাওয়া। সেখানে কি প্রমাণ দেবে নিজের পক্ষে। বলবে স্ত্রী ব্যাভিচারিণী, কিন্তু মুখের কথাই তো সব নয়। রেণু যদি আদালতে আপত্তি না জানায় তাহলে ভরতুকির ব্যাপার আছে। যদ্দিন রেণু বিয়ে না করবে তদ্দিন ওকে মোটা খরচ দিয়ে যেতে হবে নিশ্চয়ই। শুধু প্রমাণ চাই এখন।

ওকে ভ্রষ্টা প্রমাণ করার রসদ দরকার। বাপের বাড়ি পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না। বরং এখানেই চোখে চোখে থাক। আর তখনি ওর মনে পড়ে গেলো বোসদার কথা। বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন এককালে। রিটায়ার করে এখন একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি খুলেছেন। বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া ভালো কেস বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, একদিন দেখা হতেই আফসোস করে বলেছিলেন। বোসদাকে ভার দিলে কেমন হয়! যদি কিছু খরচাপাতি হয় হোক। অন্তত সারাজীবন (যতদিন না রেণু বিয়ে করে বা মারা যায়) ততদিন তো টাকা দিয়ে যেতে হবে না। আর সে টাকার যা যোগফল তা ভাবাও যায় না। রেণুকে ডিভোর্স পেয়ে গেলেই বিয়ে করবে? তখন যদি সেই ছেলেটি কেটে পড়ে? তাহলে তো সর্বনাশ। চিরকাল কাঁধে বোঝা বয়ে নিয়ে চলা। অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদ মানে লোক জানাজানি, সবাই বলবে বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে যাওয়ার ফলভোগ করতে হলো। আর বিচ্ছেদ চাইলেই তো পাওয়া যাবে না। যতদূর মনে হয় তার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে কতগুলো নিয়ম পালন করতে হয়। উপায় না থাকলে তা করতেই হবে। কি করা যাবে। আর একটা উপায় হলো—সমস্ত শরীর শির শির করে উঠলো বরেনের। ঠাণ্ডা মাথায় ও কি করে রেণুকে খুন করবে? খুন করে যদি ধরা না পড়ে তাহলে বিনা ঝামেলায় মুক্তি পেয়ে যেতে পারে ও। আমি আমার বৌকে খুন করবো—ভাবতে গিয়েই মনে মনে বলে ফেললো, অসম্ভব। ওর এতো দিনের শিক্ষা, রুচি ওকে কি করে খুন করতে সাহায্য করবে! অবশ্য রেণুর ওপর কোন দয়ামায়া আর নেই ওর। হাত থেকে শাঁখা খুলে নিয়ে রেণু গিয়েছিলো প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে। রাগে আবার জ্বলুনি ধরলো বরেনের। ঠিক আছে, আগে বোসদার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাক, বোসদা যদি কোন প্রমাণ যোগাড় করতে পারেন, তাহলে তো হয়েই গেল। হঠাৎ ওর মনে পড়লো গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় ইংরেজী বই-এর দোকানে

ডিসপ্লে করা একটা বই দেখেছিলো কদিন আগে। মলাটটা খুব সুন্দর। বইটার নাম 'পয়েজ্‌ড ফর দ্য কিল্।' একবার পড়তে হবে বইটা মনে মনে ভাবল বরেন।

বোসদার নতুন অফিস লর্ড সিনহা রোডে। লাঞ্চের ফাঁকে এক দুপুরে গিয়ে সব খুলে বললো বরেন। আসবার আগে ও অনেক ভেবেছে। এসব কথা, নিজের অসহায়তার কথা চট করে আর একজনকে বলার জন্য সঙ্কোচ হচ্ছিলো ওর। শেষ পর্যন্ত ঠিক করে নিয়েছে, না, বলাই ভালো। ডাক্তার এবং গোয়েন্দার কাছে কিছু গোপন রাখতে নেই। বোসদার অফিস বেশ ছিমছাম। লম্বা চুরুট মুখে রেখে বোসদা সব শুনলেন। বরেন ভেবেছিলো হয়তো বোসদা দুঃখ প্রকাশ করবেন। তা না করে সরাসরি কাজের কথায় এসে গেলেন বলে মনে মনে হাঁফ ছাড়লো বরেন।

বোসদা বললেন, 'যদি কোন ছেলে এর পেছনে থাকে তবে যে সে য়ুনিভার্সিটিতেই পড়তে' এটা মনে করার কি কারণ আছে? একটি মেয়ে তার উনিশ কুড়ি বছর অবধি তো নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে কাটিয়েছে। আর যেরকম জেদের কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে দীর্ঘকালের জানাশোনা।'

বরেন চট করে কিছু বললো না। এটাও তো হতে পারে। রেণুর কোন বাল্য প্রেমিক থাকতে পারে। দু-এক বছরের য়ুনিভার্সিটিতে জানাশুনায় কোনো মেয়ে কি এতোটা রিস্ক নিতে পারে? বরেন মাথা নাড়লো।

আমার মনে হয় আরো পাঁচ ছয় বছর আগের থেকে খোঁজ করা দরকার। তেমন যদি কোন ব্যর্থ-প্রেমিক থেকে থাকে তবে প্রমাণ ট্রমান হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুখার্জী, মুস্কিলের ব্যাপার হলো আমার যে তিনজন এজেন্ট আছে তারা ভীষণ ব্যস্ত। এখন ওদের দিয়ে নতুন কাজ করাতেই পারবো না। মাসখানেক পরে হলে হয় না?'

বরেন বললো, 'আমি চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ করা যায়—।'

আরো একমাস অপেক্ষা করতে ভালো লাগছিলো না বরেনের।

চোখ বন্ধ করে কিছু চিন্তা করে নিলেন বোসদা, এক কাজ করুন। মাঝে মাঝে আমি বাইরের কিছু লোককে দিয়ে কাজ করাই। আমি একটি লোককে জানি সে এসব ঘরোয়া ব্যাপারে এফিসিয়েন্ট। একটু বাজে বকে তবে দারুন কাজের। কাছিমের মত গোঁ, কাজ হাসিল করবেই। আমি ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বরেন, ঠিক আছে আপনি ব্যাপারটা ভালো বুঝবেন। আর হ্যাঁ, কি রকম খরচ লাগবে যদি জানতাম!'

হেসে ফেললেন বোস, 'আমার এজেন্সি মারফৎ কাজ করলে অনেক পড়বে। কিন্তু আপনি আমার পরিচিত আর এই লোকটিও আমার এজেন্সির নয়। তাই সরাসরি ওকেই দেবেন কাজ হয়ে গেলে। শ দুয়েক দিলেই হবে।'

শেয়ার বাজারের দালাল, বিয়ের ঘটক, সরস্বতী পুজোর পুরুতে অথবা প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার ব্রজবিলাসকে দেখলে এর যে কোন একটা ভাবা যায়। প্রথম দর্শনে ভরসা পায়নি বরেন। কিন্তু বোসদা যখন পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই ফালতু হবে না। তাছাড়া লোকটা নতুন কিছু জিজ্ঞাসা করলো না ওকে, সবই যেন জেনে বসে আছে বোসদার কাছে। রেণুদের ঠিকানা নিয়ে চলে গেলো। বললো, 'নিশ্চিত থাকুন কাজ হবেই, আগে কাজ তবে পয়সা। শুধু মাঝে মাঝে এক্সট্রা খরচ যদি কিছু হয়—।' হাতের তাবিচ ধরেছিলো লোকটা।

ব্রজবিলাস প্রথম দিন যে খবর নিয়ে এলো তাতে অবাক হয়ে গেলেও একটু মুষড়ে পড়লো বরেন। কি করে খবর পেয়েছে কিছুতেই বলছে না, বলে ট্রেড সিক্রেট, সোরস বলতে নেই। কিন্তু মুস্কিল হলো এই ভদ্রলোক এখন বিবাহিত, একটি ছেলের বাবা।

ব্রজবিলাস হলপ করে বললো, আমি স্যার সিওর ওর সঙ্গে উনি, মানে, মানে, বুঝতেই পারছেন, গাড়িতে করে বেড়াতে যেতেন এখানে ওখানে। পাইলট অফিসার, তবে ইদানিং খুব অসুস্থ, মালফাল খেয়ে লিভারের কিছু বাকী রাখেন নি আর। তবে স্যার উনি যে লাস্ট ছয় মাস ছুটি নিয়ে বাড়িতেই আছেন। একদম বাইরে বেরোন না। এটাই যে মুস্কিল।'

ব্রজবিলাস চলে গেলো আবো খবর আনতে। কি খেয়াল হলো রেণুর ঘরে এলো বরেন। ইদানিং ও এই ঘরেই থাকে। দুই আলমারী বোঝাই বই এখন ওর সঙ্গী। রেণু তাকাতেই বরেন বললো, 'বিভূতিবাবু এসেছিলেন।'

রেণুর মুখ দেখে মনে হলো ও বুঝতে পারছে না কথাটা, বরেন আবার বললো, বিভূতি গাঙ্গুলি। পাইলট। চিনতে পারো ?

একটু চমকে গেল যেন রেণু। তারপর মুখ নামিয়ে নিলো।

'অনেক কথা বললো।' বরেন খোঁচাতে চাইলো।

'ভালোই তো।' বরেনের মনে হলো রেণু যেন হাসছে। ও যে মিথ্যে কথা বলছে তা যেন রেণু বুঝতে পারছে। অথবা বিভূতি গাঙ্গুলীকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না রেণু। নিশ্চিত বসে আছে। অথচ এর সঙ্গে রেণু ঘুরে বেড়াতো, কেন ? নিশ্চয়ই একটা নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো ওঁদের। সেই সম্পর্কটা এতদিন কি বাঁচিয়ে রেখেছে ? ব্রজবিলাস বলেছে লোকটা গত ছয় মাস বাড়িতে আছে তাছাড়া বাচ্চা বৌ সমেত একটা লোকের জন্য কোন মেয়ে বিবাহিত জীবন নষ্ট করে না এইভাবে।

কয়েকদিন পর আবার এসে হাজির ব্রজবিলাস। ও আসতো একটু রাত করে। বাইরের বারান্দায় বসে দরজা ভেজিয়ে দিতো বরেন ব্রজবিলাস এসে তাবিচ আঁকড়ে দাঁড়ালো, স্যার একটু মুস্কিল হয়ে গেছে যে !

কি হল ? বরেন খুব উৎসুক।

পাইলটের সঙ্গে তো ইদানিং কোন যোগাযোগ পেলাম না।

তবে স্যার পাইলট ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক কাল আগেই কাটান ছাড়ান হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। ব্রজবিলাস উসখুস করছিলো।

'কি করে বুঝলেন ?'

'নাহলে ঐ সময়ের পরই একজন অধ্যাপকের সঙ্গে নাকি ওর অনেক ইয়ে টিয়ে ছিল !' ব্রজবিলাস বলে ফেললো।

সোজা হয়ে বসলো বরেন। অধ্যাপক। এটাই ঠিক হতে পারে। রেণুর মেন্টালিটির সঙ্গে একজন অধ্যাপককে খুব মানিয়ে যেতে পারে। অধ্যাপক বলতে তো চট করে ইচ্ছাকৃত বা স্বভাবজ গম্ভীর, অনেক পড়াশুনা করে নিজের রুচিবোধ শানিয়ে নেওয়া এক শ্রেণীর মানুষকে মনে পড়ে যায় যাঁরা কতগুলো শাসনের প্রাচীরের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন। তবে ইদানিং এইসব সংজ্ঞা পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। এখন এই অধ্যাপকটি কোন শ্রেণীর ? রেণু যখন—।

মাথা নাড়লো ব্রজবিলাস, 'ওনার সঙ্গে খুব থিকথিকে ভাব ছিলো স্যার। একই পাড়ায় থাকতো তো, ব্যাচিলার লোক, রাত বিরেতেও পড়াশুনা বুঝতে যেতেন উনি।

গুড্ গুড্, খুশী হলো বরেন, আরো ডিটেলস চাই।

পাওয়া গেলো না স্যার। আফসোসের ভঙ্গী করলো ব্রজবিলাস, বছর চারেক আগে অধ্যাপক আমেরিকায় চলে গিয়েছেন পার্মানেন্টলি। ওখানেই বিয়ে থা করেছেন। সম্প্রতি রমজ বাচ্চা দেশে এসেছিলেন দিন দশেকের জন্য।

অধ্যাপকের নাম জেনে নিয়ে রেণুকে বললো বরেন। এমন ভাব করে বললো, যেন ও রেণুর সব কথা জেনে যাচ্ছে। অথচ রেণুর কাছ থেকে শুধু অবাক হওয়া ছাড়া অন্য কোন অভিব্যক্তি পেলো না বরেন। যেন অনেকদিন আগে ওর একবার বিকোলাই হয়েছিলো, বরেন রেণুকে তা মনে করিয়ে দিলো—এই পর্যন্ত।

ব্রজবিলাস এর পরে যার কথা বললো, বিস্ময়ে থ হয়ে গেলো বরেন। রেণু সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই যেন মিলছিলো না আর। ছেলেটি নেহাৎই লপেটা-মার্কা, ইদানিং পার্টি কালারে ঢোকার

চেষ্টায় ছিলো, ওয়াগন ব্রেকারের দলে পাওয়া গেছে বলে মিসা হয়ে গেছে ওর। এইরকম একটি ছেলের সঙ্গে রেণু নাকি প্রেম করতো। হা ঈশ্বর!

আর একজনের খবর আনলো ব্রজবিলাস, সে নাকি রোজ গড়িয়'হাটা মোড় থেকে ওদের বাড়ি পর্যন্ত রেণুর বডিগার্ড হয়ে যেতো। এটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না ব্রজবিলাস। তবে এটাও নাকি দীর্ঘদিন ধরে চলেছিলো।

মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড় হলো বরেনের। রেণু করেছেটা কি! একটার পর একটা ছেলের সঙ্গে পিরীত করে গেছে ঐ বয়স থেকে? কিন্তু মুস্কিল হলো, এইসব চরিত্ররা এখন কেউ রেণুর সঙ্গে জড়িয়ে নেই। ব্রজবিলাসের কথামত এরা নানা সময়ে ওর সঙ্গে থিকথিকে প্রেম করে কেটে পড়েছে। গা ঘিন ঘিন করে উঠলো বরেনের। সেদিন রাগের মাথায় রেণুকে ও বেশ্যা বলেছিলো, কথাটা এখন কি রকম সত্যি সত্যি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাহলে, এইসব প্রেমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে, রেণু এখন কার ওপর ভরসা করে এসব কাণ্ড করছে?

এই সময় ব্রজবিলাস আবার খবর আনলো, রেণু নাকি বিয়ের ঠিক আগে একটি ছেলের সঙ্গে ঘুরতো। য়ুনিভার্সিটির বন্ধু। সে এখন কোথায় আছে খুঁজে বের করতে হবে। যেখান থেকে শুরু সেখানেই যেন ফিরে এলো বরেন। এখন একটার পর একটা চরিত্রের এইসব পরিণতিতে ওর ভয় হলো হয়তো দেখবে এই ছেলেটিও আর নেই রেণুর সঙ্গে জড়িয়ে—বলা যায় না কিছু। বরেনের মনে হলো, এই মেয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেও অন্য ছেলের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যেতে পারে।

এই রকম একটা দিনে ও গ্রাণ্ড হোটেলের নিচ থেকে 'পয়েজড ফর দ্য কিল্' বইটা কিনে আনলো। একটা বাঘ অনেক অনুসরণ করে কোন জলা জায়গায় ঝোপের আড়ালে এসে ওৎ পেতে বসেছে, অদূরেই তার শিকার। এবার সামনের পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে লাফ

দেবার ভঙ্গী করছে বাঘ, যে কোন মুহূর্তেই। কি করে খুন করতে হয়। এই ভাবেও ভাবা যায় ব্যাপারটা। পৃথিবীর জটিলতম কিছু খুনের ঘটনা, যে কোন খুনীরা ধরা পড়েছে কি কি ভুল করে অথবা ধরা পড়েনি কোন কৃতিত্বে—বিস্তারিত লেখা আছে বইটায়। কেউ যদি চায় স্বচ্ছন্দে ঘটনাগুলো থেকে একটা ফর্মুলা তৈরি করে নিতে পারে যাব নাম দেওয়া যায় কি করে খুন করতে হয়।

ব্রজবিলাস কতদূর কাজ করতে পারবে—এখন সন্দেহ হচ্ছে বরেনের। ও যেমন একটার পর একটা নাম এনে হাজির করছে তাতে কতদূব কি করা যায়। কয়েকটা নাম কখনো প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হবে না। তার জন্য সলিড কিছু চাই। আর সেটা না হলে ব্রজবিলাসের পেছনে টাকা ঢালা পণ্ডশ্রম হবে। এক এক সময় মনে হচ্ছে রেণুর সঙ্গে সহযোগিতা করে বিচ্ছেদটা করে নেওয়াই ভালো। না হয় প্রতি মাসে মোটা টাকা রেণুকে দিয়ে যাবে ও। এই ঝামেলা, এই মানসিক অশান্তি থেকে তো নিস্তার পাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, যেন সে অতগুলো টাকা দিয়ে যাবে একজন ভ্রষ্টা মেয়েছেলেকে! কোন যুক্তি নেই এর। টাকাটা তাকে শ্রম দিয়ে রোজগার করতে হচ্ছে আর তার অংশ রেণু মজাসে ভোগ করবে স্রেফ আইনের সুবাদে? না, প্রমাণ চাই একটা কিছু, যা রেণুকে ভ্রষ্টা বলে চিহ্নিত করবে। আর তা যদি না পাওয়া যায়?

রেণুকে নিয়ে ও যাদ সানরাইজ দেখতে টাইগার হিলে যায় অথবা গোপালপুরে সমুদ্র স্নানে? সবচেয়ে নিরাপদ এটা। কিছুই না, ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সময় বুঝে একটু ঠেলে দেওয়া। তারপর চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করে ওঠা। কেউ সন্দেহ অবধি করতে পারবে না। বইটাতে তো এরকম খুনের কথা বলা আছে। আজকাল খুন করতে কেউ ছুরি বা বিষ ব্যবহার করে না। এক ভদ্রমহিলার পেটে আলসার মত ছিলো। মাঝে মাঝে যন্ত্রণা পেতো খুব। চিকিৎসা চলছিলো। একদিন ভদ্রলোক শুনলেন স্ত্রীর মাথা ধরেছে। এ্যাসপিরিন খেতে বললেন। কাজ

হলো। তারপর আবার একদিন হতেই মাত্রা বাড়াতে বললেন। গোটা আটেক এ্যাসপিরিন গুড়ো করে কাগজে ঢেলে স্ত্রীকে দিলেন। খেয়ে বেশ আরাম হলো। তারপর ঘণ্টা কয়েক বাদে পেটে যন্ত্রণা। শেষে রক্ত বমি। অনেক চেষ্টাতেও বাঁচানো গেলো না শেষ পর্যন্ত। পেটের ঘা সহ্য করেনি এ্যাসপিরিনকে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে গণ্য হলো ডাক্তারের কাছে উনি বলেছিলেন মাথা ধরার জন্য এ্যাসপিরিন খেয়েছিলো। সে তো খেয়েই থাকেন, নতুন কিছু নয়। কোন সন্দেহ নেই তার মনে। স্বচ্ছন্দে করে গেলেন। স্বামী বেচারীকে ছুরি বা গুলি ছুঁড়তে হলো না।

কিন্তু রেণু কি ওর সঙ্গে বাইরে যেতে চাইবে? যদি না বলে দেয় মুখের ওপর। বিয়ের পর হনিমুনে যাচ্ছি এটা এখন বলতে গেলে কেমন হাস্যকর শোনাবে না? একটা কিছু মতলব বের করার চিন্তায় পেয়ে বসলো ওকে।

দুপুরে অফিসে বসে কাজ করছিলো। এমন সময় ঝড়ের মত নীরেন দরজা ঠেলে ঢুকলো। তখন ওর কাছে লোক বসে। নীরেনকে একবার দেখে ও বাইরে অপেক্ষা করতে বললো। কাজের সময় ও তৃতীয় ব্যক্তিকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করে। তাছাড়া নীরেনকে এই সময় ওর অফিসে আসতে দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেলো ও। কোন সীমারেখা মানছে না ছেলেটা ইদানিং ভীষণ বেপরোয়া হয়ে গেছে নীরেন। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস হতো না নীরেনের। রেণু এসে ওর সর্বনাশ সবদিক দিয়েই করে দিলো! বাকী রাখলো না কিছু।

কাজে মন বসলো না। নীরেন কিছু বলতে যাচ্ছিলো, দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বাইরে চলে গিয়েছে এখন। কিন্তু ওর উত্তেজিত মুখ বরেন দেখেছে, মুখে ঘাম, বোঝাই যায় খুব জোর কিছু জানতে পেরেছে ও। এবং সেটা যে রেণুর বিষয়ে তা নিশ্চিত করে বলে

দেওয়া যায়। নিজের পড়াশুনার চেয়ে আড্ডা আর এইসব ব্যাপারে আগ্রহ ওর বেশী।

মিনিট দশেক পরে সামনের ভদ্রলোক উঠে গেলে ভাইকে ডাকলো বরেন। নীরেন এসে চেয়ার টেনে বসলো। এখন একটু শান্ত হয়েছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

বরেন বললো, কি ব্যাপার, অফিসে আসতে হলো কেন ?

নীরেন হাসলো, উনি আজ বাপের বাড়িতে চিঠি লিখেছেন।

বরেন চুপ করে ভাইকে দেখলো। এই একটা কথা বলতে ও এখানে ছুটে এসেছে ? অবশ্যই রেণুকে বারণ করে দেওয়া ছিলো ও কোন চিঠিপত্র যেন না লেখে। তবে এ খবরটা তো বাড়িতে গেলেও দেওয়া যেতো। বরেন মনে মনে ঠিক করে নিলো, নীরেনকে সরাসরি বলবে যাতে এইসব ব্যাপারে ও নাক না গলায়। কিন্তু তার আগেই নীরেন পকেট থেকে একটা খাম বের করে টেবিলের ওপর রেখে দিলো।

খামটা তুলে নিলো বরেন। ওপরে দীপকের ঠিকানা লেখা। অবাক হয়ে ও ভাইকে বললো, এ চিঠি তুই কোথায় পেলি ?

এবার বেশ উত্তেজিত হয়ে নীরেন ঘটনাটা বললো। যেন একটা দারুণ এ্যাডভেঞ্চার করে এসেছে। বাড়ির সামনে একটা রকে বসে আড্ডা দিচ্ছিলো ওরা। এগারটা নাগাদ পাড়া ফাঁকা। এমন সময় ও ওদের বাড়ির ঝিকে নেমে আসতে দেখলো। বুড়ি এদিক ওদিক তাকিয়ে লেটার বক্সের মধ্যে কিছু ফেলে তর তর করে উঠে গেলো সিঁড়ি দিয়ে। প্রথমটা কিছু ভাবেনি নীরেন, কিন্তু বুড়ি ঝি-এর ফিরে যাওয়া দেখে ওর কেমন লাগলো। ওদের বাড়িতে চিঠিপত্র আসা যাওয়া করে খুবই কম। এখন বাড়িতে মা আর উনি আছেন। মা তো চিঠিপত্র লেখেনই না। ও অবশ্য বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারতো কে দিয়েছে কিন্তু তাতে ব্যাপারটা গোপন থাকবে না।

ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করার পর পোস্ট অফিসের লোক এসে

যখন তালা খুলে চিঠি বের করছে তখন ও মিথ্যে করে তাকে বলেছে যে চিঠিটা ভুল করে ফেলে দিয়েছে লেটার বক্সে। পিয়ন কিছুতেই দিতে চাইছিলো না। পোস্ট অফিসে গিয়ে পোস্ট মাস্টারকে বলতে বলেছিলো। শেষ পর্যন্ত কায়দা কৌশল করে ও এই চিঠিটা উদ্ধার করেছে। ওর সন্দেহ নিশ্চয়ই এটা দামী চিঠি। কারণ যতদূর মনে হয় উনি এখানে এসে কোন চিঠি লেখেন নি, এটাতে তাই মনের কথা লিখতে পারেন। ওর অবশ্যি ভয় ছিলো, লেটার বক্সের অনেক চিঠির মধ্যে কোনটা ওদের ঝি ফেলেছে ঠাওর করে উঠতে পারবে না। এটাও তো হতে পারতো উনি সেই ছেলেটাকে লিখেছেন। তবে উনার হাতের লেখা নিশ্চয়ই ভালো হবে আর বক্সে কত চিঠিই না থাকতে পারে—এইসব থেকে রিস্ক নিয়েছিলো নীরেন। বাপের বাড়ির ঠিকানা থাকায় অবশ্য কোন অসুবিধা হয়নি খামটাকে চিনে ফেলতে।

কথাগুলো শুনে চোখের কোণে ভাই-এর দিকে তাকালো বরেন। বেশ কৃতিত্বের হাসি ওর মুখে। এটা অন্তত আশার কথা যে ও খামটা উৎসাহের আতিশয্যে খুলে বসেনি। মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলো বরেন। আমার অবস্থা বুঝতেই পারছো। বেঁচে আছি কি করে জানি না। এখন প্রতিদিন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে অনেক রকম। দাদা, তুমি আমার একটা কাজ করবে? তোমাকে যে ছেলেটির কথা বলতাম তার কাছ থেকে আমার একটা চিঠি তুমি ফেরৎ নিয়ে এসো। কেন ওকে লিখেছিলাম জানি না, মাঝে মাঝে মনে হয় প্রতি মুহূর্তে কত বোকামি না আমি করে চলেছি। চিঠিটা অনেক বড়, বিয়ের কদিন আগে লেখা। আগে হস্টেলে থাকতো সুমিত, এখন পাশেই আর একটা মেসে। বিডন স্ট্রীট ধরে মানিকতলার দিকে এগোতেই হেঁদোর বা দিকে। সবাই চেনে। কাজটা দ্রুত করতে হবে তোমাকে। নইলে এপক্ষ খোঁজ পেয়ে যেতে পারে।' তারপর অনেকটা ফাঁক, 'আমাকে একদিন এসে নিয়ে যাওনা, দাদা।'

চিঠিটা পড়ে চোখ বন্ধ করলো বরেন, 'ঠিক আছে, তুই যা।'

'কি লিখেছে?' নীরেন ঝুঁকে বসলো।

'আমি তোকে চলে যেতে বলেছি, যা' চাপা গলায় বললো বরেন। ওর মনে হলো নীরেনকে কি ও এখন চড় মারতে পারবে না? দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো নীরেন। তারপর কেমন একটা ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

চিঠিটা সামনে রাখলো বরেন, বিডন স্ট্রীটের মেসবাড়িতে থাকে সেই ছেলেটি, যার নাম সুমিত। আর তার কাছেই একটা চিঠি আছে, যার জন্য রেণুর ভয়। খুশীতে উঠে দাঁড়ালো ও। এখনই যদি ব্রজবিলাসকে পাওয়া যেতো। ওর ভাই ব্রজবিলাস যা পারেনি তাই পেরেছে। আর হাওয়ার ওপর বসে নেই বরেন, এখন আসল দরজা সামনে। হঠাৎ ওর মনে হলো নীরেনকে ওভাবে না বললেই হতো। এতো বড় একটা উপকার করলো ছেলেটা। বরং ওকে কিছু টাকা দিয়ে বললে হতো ইচ্ছে মতন খরচ করতে। শেষে নিজেই হেসে ফেললো বরেন। টিপস্? নিজের ভাইকে? বাইরে বেরিয়ে ও ফাঁকা করিডোর দেখলো। নীরেন চলে গেছে।

ধার

রেণু এবং নিজের ছবিটা এবার দেওয়াল থেকে নামিয়ে রাখা দরকার, মনে মনে বললো বরেন। এতদিন ধরে এতো সব ঘটে যাচ্ছে অথচ ছবিটার কথা মনে হয়নি একবারও। এখন নিজেদের যা সম্পর্ক তাতে এই ছবিটা বিশ্রীরকমের বেমানান।

রেণু এখন বাপের বাড়িতে। ঐ ছোট্ট বোকামিটা যদি ও না করতো তাহলে সুমিত নামের এই ছেলেটির কথা জানতে কত সময় লেগে যেত। আর কি আশ্চর্য, বাপের বাড়িতে ফিরে গিয়েই ও চিঠিটা পাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। চিঠিতে কি লেখা আছে কে জানে! নিশ্চয়ই এমন কিছু গোপন কলঙ্কের কথা যা প্রকাশ হতে দিতে চায় না রেণু। আর তার জন্য এই ছেলেটির সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙ্গে দিতে পারছে সহজেই। সম্পর্ক ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া আর কি!

ওর ভাই যখন লোকজন নিয়ে ছেলেটিকে মারধোর করেছে, তখন নিশ্চয়ই এর পেছনে রেণুর সম্মতি ছিল। আর এরপর কি ছেলেটা রেণুকে সহজ হয়ে গ্রহণ করবে? অসম্ভব। তাহলে রেণু নিজের বিবাহিত জীবন এভাবে নষ্ট করলো কেন? এতে তো দুকুলই হারিয়ে ফেললো। চিঠিতে ও কি এমন কথা লিখেছে? রেণু কি কখনো কনসিভ করেছিলো সেসব কথা কি চিঠিতে লেখা আছে? আর তা যদি লেখা থাকে, তাহলে ছেলেটি সেসব ক্ষমাঘেন্না করে নিতে পারবে বলে রেণুর ধারণা ছিলো? বুঝতে পারি না আমি, মাথা নাড়লো বরেন, অল্প বয়সের প্রেম বোধ হয় সবকিছু ক্ষমা করে দিতে পারে। এবং এই প্রথম বরেন, সুমিতকে হিংসা করতে লাগলো।

যাক, যা হবার তা হয়েছে। এখন আরো কিছু খরচ করে যদি চিঠিটা হাতে এসে যায়, তাহলে একটানে রেণুকে ছুঁড়ে ফেলে, দিতে পারবে ও। তারপর নিশ্চিত জীবন। যেভাবে এতোদিন কেটে গেছে ওর, অন্তত অশান্তি হয়নি!

বারান্দায় বেরিয়ে বরেন দেখলো একটা ট্যাক্সী হেডলাইট জ্বেলে এসে ওদের বাড়ির নিচে দাঁড়ালো। অলস চোখে ও দেখলো একজন মহিলা দরজা খুলে নেমে ভাড়া দিচ্ছেন ড্রাইভারকে। এতে ওপর থেকে আবছা আলোয় মহিলার মাথা আর ঘাড় দেখতে পেলো ও। বিয়ে করেও আমি একটি নারীর শরীর ভোগ করতে পারলাম না, হেসে উঠলো বরেন। মানুষ, কি আশায় এবং বিশ্বাসে নিজের কাছে সৎ হয়ে থাকে। ওদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়তো সে নাকি ঐ বয়সেই নিয়মিত খদ্দের ছিলো। তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'কেন যাস?'

'মজা করতে', ছেলেটি বলেছিলো, রোজ রোজ নিত্যনতুন জিনিষ, মনে হয় আমারই হারেম। যা আনন্দ হয় না—।' বরেন লক্ষ্য করেছিলো কথাটা বলার সময় ওর কোন লজ্জা বা পাপবোধ ছিলো

না। কিন্তু কি আশ্চর্য সংস্কারে ওর নিজেরই গা ঘিনঘিন করেছিলো তখন।

বাইরের দরজায় কেউ শব্দ করলো। কে এসেছে? এখন কারো সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। বোধহয় ঝি দরজা খুলে দিলো। ছোট ছোট আওয়াজ উঠছে চটির, মেয়েলি। বারান্দার চেয়ারে বসে ঘাড় ঘোরালো বরেন। দরজায় রেণু দাঁড়িয়ে।

চমকে উঠলো বরেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও। রেণু দাঁড়িয়ে আছে দরজায় একটা হাত রেখে। পেছনে ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। তাই এখান থেকে ওর মুখ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবে শরীরের বাহির-রেখায় আলো চকচক করছে। ওরতো আসার কথা ছিলো না। এবং যাবার সময় বরেন বলে দিয়েছিল এটা শেষবারের জন্য যাওয়া, তবু কি সাহসে ও ফিরে এলো। এখন কোন কিছুর পরোয়া করে না বরেন। রেণু মুখ নামিয়ে আছে এখনোও। ওর হাত কি কাঁপছে?

'কি ব্যাপার?' তিক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলো বরেন।

'আমি ফিরে এলাম।' রেণুর মাথা এখনো নিচের দিকে।

'কেন?' বরেন কথা খুঁজছিলো।

'আর ফিরে যাবো না বলে।' রেণু এবার মুখ তুললো।

'না!' চিৎকার করে উঠলো বরেন, 'তা আর হয় না। তুমি চলে যাও।' হঠাৎ ওর শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। দ্রুত ঘরে ঢুকে ও দেওয়াল থেকে ছবিটা টেনে নামিয়ে ছুঁড়ে দিলো রেণুর পায়ের কাছে। ঝনঝন শব্দ করে কাঁচ ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে। চমকে সরে দাঁড়ালো রেণু। বরেন দেখলো অজস্র কুচি কুচি ভাঙ্গা দাগ ওর মুখের ওপর চেপে বসেছে। একটা হাত বাড়িয়ে ছবি দেখিয়ে বরেন বললো, 'ওটার মতন তোমাকেও যদি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতাম!' অদ্ভুত একটা যন্ত্রণায় বরেনের গলার স্বর বুঁজে আসছিলো।

কয়েক পা হেঁটে ঘরের ভিতরে এলো রেণু, 'আমি, আমি পারছি না।'

'কি পারছো না, কি মতলব তোমার, বলো? আবার কোন প্ল্যান করে এসেছো নিশ্চয়ই। তুমি চলে যাও, আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি, তোমাকে আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই; আই হেট ইউ।' বরেন হাঁপাচ্ছিল।

'আমি ক্ষমা চাইছি, আমি আর অবাধ্য হবো না, আপনি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করুন, আমি, আমি সেই জন্যই এসেছি—।' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে একটা কান্না সামলালো রেণু।

'কেন? তোমার সুমিতবাবু কি বলছে? এতো পিরীত দুদিনেই শেষ হয়ে গেলো? পাঁচ বছর ধরে অপেক্ষা করবে না? এখন বোধ হয় লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছে? চিঠিটার জন্য এতো প্রেম উড়ে গেলো এক নিমেষেই হ্যাঁ।

'আপনি যা বলার বলুন, আমি সব শুনবো, শুধু—।

'না তা হতে পারে না। তুমি আমার জীবন বিষাক্ত করেছো। তোমাকে মেরে ফেললেও আমার সুখ হবে না। আমি, আমার দিকে লোকে তাকিয়ে হাসে। একবারও তুমি ভাবোনি যে, আমি তোমার কাছে কোন অন্যায় করিনি। এটা বুঝতে পারছো না কেন, আমি তোমাকে ঘেন্না করি, ঘেন্না করি। তুমি—তোমার চেয়ে বাজারের একটা মেয়ে অনেক ভালো, তার প্রফেসনে সে সৎ থাকে। তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে—গেট আউট।'

মাথার ওপর আলো, রেণু দাঁড়িয়ে আছে ঘরের সামনে। বরেন কথা বলতে বলতে ওর দিকে তাকালো। এরকম মুখের দিকে তাকালে বুকের ভিতর কেমন করে। মাথা নাড়লো বরেন, না, আর কোন ভুল করতে পারে না ও।

'তোমার চিঠি আমি পাবোই। তুমি কি বোকামি করেছ রেণু, সুমিতকে মারধোর না করলে বোধ হয় চিঠিটা পাওয়া এতো সহজ হতো না।'

চমকে উঠলো রেণু। বরেন বুঝতে পারলো মারধোরের খবরটা যে ও পেয়ে যাবে রেণু ভাবতে পারেনি। হা হা হা। প্রাণপণে হাসতে ইচ্ছে করছে এখন। ওর মনে পড়লো সেদিন রেণুর ঘরে গিয়ে ও খুশীতে চিবিয়ে চিবিয়ে কি সুন্দর করে কথাগুলো বলেছিলো। আর অন্য নাম শুনে যা হয়নি, সুমিতের নাম শুনেই দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিলো রেণু। বরেন যখন বলেছিলো, 'সুমিত বলে কোন ছোঁড়াকে চেনো? সে নাকি খুব অর্থকষ্টে কাটাচ্ছে? তাই আমার কাছে একটা মূল্যবান জিনিষ বিক্রী করবে—খুব খুব দামী। এখন মুখ ঢাকছো কেন? কি লিখেছ সেই চিঠিতে?' নীরেনের চিঠি পাওয়ার ঘটনাটা বলেনি ও, ওটা বললে মজা কমে যেতো।

আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়লো রেণু, তারপর দুহাতের মধ্যে মুখ রেখে কেঁদে ফেললো। কেন ন্যাকামো করছো, তোমার তো প্রেম আছে অনেক, এবার আব একজনকে ধরো। এতোদিন ধরে জ্বালিয়ে-পুরিয়ে এখন আমার কাছে এসেছো মলম বোলাতে? কেন এসেছ? হঠাৎ মতিগতি বদলে গেলো যে!' বরেন তারিয়ে তারিয়ে বললো, রেণু কোন উত্তর দিলো না। ওর পিঠ কাঁপছিলো। আর এই সময় বরেন লক্ষ্য করলো ও বিয়ের বেনারসীটা পরে এসেছে, গা ভর্তি সেই গয়নাগুলো; হাতে শাঁখা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালো বরেন, 'আজ রাত হয়েছে, কাল সকালেই চলে যাবে। আমি একটা বেশ্যার মুখ সকালবেলায় দেখতে চাই না।'

বারান্দা দিয়ে ওঘরে যেতে যেতে বরেন থমকে দাঁড়ালো। আশে পাশের ফ্লাটের লোক মুখ বাড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। রেণু এসেছে সবাই যেন টের পেয়ে গেছে। সবাই একটা নাটক দেখার জন্য সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওদের উত্তেজিত কথাগুলো কি ওরা শুনতে পেয়েছে। আঃ, মানুষ কেন এতো কৌতূহলী হয়। বরেন শুনতে পেলো, বাইরের ঘরে ফোনটা বাজছে। মানুষ এতো কথা বলে কেন?

তিন

ঘুমিয়ে পড়েছিলো সুমিত। দরজায় অনেক শব্দ হবার পর ও চোখ মেললো। তখনো গায়ে ব্যাথা। কখন যে সকাল হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি একদম। দরজায় শব্দটা একনাগাড়ে হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কপালে হাত রাখলো ও, না জ্বর আসেনি।

দরজা খুলতেই ও অবাক হয়ে গেলো। দীপক দাঁড়িয়ে।

'কি ব্যাপার!'

'মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। কাল রাত্রে কি রেণু আপনার কাছে এসেছিলো? অনেক রাত্রে?'

'না তো। কেন?' ব্যাপার বুঝতে পারছিলো না সুমিত।

'আমরাও ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার এখান থেকে বাড়ি ফিরে ওকে সব বললাম। দেখলাম মুখ গম্ভীর করে বসে আছে। বললাম, আপনি কোন ক্ষতি করবেন না। ও শুধু চোখ তুলে আমাকে দেখলো। বুঝতে পারলাম, আপনাকে মারার ব্যাপারটা ও ঠিক মেনে নিতে পারছে না। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, 'কেমন আছে?' আমি যা বলার বললাম। তারপর ও কেঁদে ফেললো আর বার বার বলতে লাগলো, 'কেন মারলে, কেন মারলে?' ওকে একা থাকতে দিয়ে আমি চলে এলাম অন্য ঘরে। তারপর একসময় মা বললেন, ও নেই। সব জায়গায় খুঁজে দেখতে পেলাম না ওকে। একটা কাগজে লিখে গিয়েছিলো, 'আমার অতীতকে ভুলতে চাই, দাদা!' শুনলাম ও নাকি মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছে ভাবলাম নিশ্চয়ই বরেনের বাড়ি গিয়েছে। ওকে ফোন করলাম। দশ মিনিট ধরে রিং হলো, কেউ ধরলো না। অত রাত্রে আর বেরুলাম না। যাওয়ার পথে এখন আপনার কাছে এলাম যদি এখানে এসে থাকে।'

'না, কেউ আসেনি।' সুমিত বললো।

'তাহলে বরেনের কাছেই ফিরে গেছে। অথচ ওখান থেকে চলে আসার সময় বলেছিল, ওখানে থাকলে ও মরে যাবে। আর ফিরে যাবে না কোনদিন। অথচ কি তাড়াতাড়ি বদলে ফেললো মতটা। আচ্ছা চলি, বরেনের ওখানেই ওকে পাবো নিশ্চয়ই।'

চলে গেলো দীপক। দীপকের মুখ চোখ দেখে সুমিতের মনে হলো রেণু যে রাত্রে এখানে আসেনি এবং নিশ্চয়ই বরেনের কাছে ফিরে গেছে এতে ও খুশী হয়েছে। রেণু যদি কাল রাত্রে এখানে আসতো? বুকের মধ্যে কি একটা টনটন করে উঠলো। যদি ও বলতো, আমাকে নাও, আমি আর পারছি না। ভাবতে ভাবতে একটা শীতল জলস্রোত ওর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেলো। অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করা—আইন অক্টোপাশের মত ওকে আঁকড়ে ধরবে। ভগবানের দোহাই দিয়ে সেখান থেকে ছাড় পাওয়া নিতান্তই হাস্যকর। কিন্তু রেণু ফিরে গেলো কেন? ও তো বরেনের সঙ্গে চিরকালের জন্য সম্পর্ক কাটিয়ে চলে এসেছিলো বাপের বাড়ি। চিঠিটা পেলো না বলে নাকি, (মনটা কেমন ভার হয়ে যায়) সুমিতের ওপর মারধোর করা হয়েছে বলে। মনের মধ্যে আর একটা মন কি যে সুখের চিন্তা করে।

(টুক করে একটা মেয়ে কতদূরে চলে যায়। যে ছিলো হাতের নাগালে যে ছিলো ছায়ার মতো—কেমন করে এক ফোঁটা সিঁদুর চারপাশে অনেক লোহার গারদ সাজিয়ে দেয়।) সেদিন ভর দুপুরে রেণু এসে হাজির অফিসে। কাজ করছিলো সুমিত। নিচের রিসেপশন থেকে ওকে বললো একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন। কোন মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এটা ভাবতেও ভালো লাগে। কিন্তু কে আসতে পারে? ওর কোন পরিচিতা এই অফিসে নিশ্চয়ই আসবে না। লিফটে নেমে এসে থমকে গেলো সুমিত। রেণু বসে আছে ভিজিটর্সদের চেয়ারে। চোখে কালো চশমা। ওকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়ালো।

একটু রোগা হয়ে গেছে, মুখ যেন চৈত্র মাসের দুপুরবেলা। রেণুকে দেখেই বুকের মধ্যে, এতদিন কোথায় ছিলো কে জানে, অজস্র ঝিঁঝিঁ পোকা একসঙ্গে ডেকে উঠলো। পায়ের তলা শিরশির করছিলো। ও হাঁটতে পারছিলো না যেন। কোনরকমে কাছে গিয়ে বললো, 'তুমি!' নিজের গলার স্বর কেমন করে যে অচেনা হয়ে যায়। রেণুর চোখ দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝাই যায় কালো কাঁচের আড়ালে ও সুমিতের দিকেই তাকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত বললো, চলে এলাম।'

সুমিত ওদের রিসেপসনিস্টের দিকে একবার তাকিয়ে বললো, 'চলো, বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।' ও অফিসের এই পরিবেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইছিলো, ওর ভয় হচ্ছিলো বেমানান কিছু একটা করে ফেলতে পারে।

বাইরের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে সুমিত বললো, 'তুমি কি করে জানলে এই অফিসে আমি আছি।'

'আমি জানি, সব জানি।' রেণু বললো। বললো না ট্যাক্সি নিয়ে ও সুমিতের হোস্টেলে গিয়েছে সেখান থেকে নতুন মেসের ঠিকানা আর নতুন মেস থেকে এই অফিস। এবং এতোটা করতে এখন ওর পরিশ্রম হয়েছে অনেক।

'কোথাও বসবে, চা খাবে?' সুমিত তাকালো। এখন রেণুর সিঁথিতে আলজিভের মত সিঁদুরের আভা হঠাৎ হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে। মাথা নাড়লো রেণু, 'বড় দেরী হয়ে গেছে যে, আচ্ছা, একটুখানি।'

টিফিনের ভীড়টা একটু হালকা হয়ে গেছে বলে ট্রামরাস্তার ওপর ছোট্ট রেস্টুরেন্টের ঘেরা ঘরটা পেয়ে গেলো ওরা। রেণুর সঙ্গে এই পথটুকু হাঁটতে হাঁটতে এসে ওর মনে হয়েছে একটু দূরত্ব রেখে হাঁটছে রেণু, যেন ও কার সঙ্গে যাচ্ছে কাউকে বুঝতে দিতে চায় না। ঘেরাঘরে ঢুকে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। চেয়ারে বসতে বসতে সুমিত বললো, 'তুমি কেমন আছ রেণু।'

চোখ থেকে চশমা খুলতে যাচ্ছিলো রেণু, হঠাৎ শান্ত হয়ে

গেলো। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো। ছটফট করে উঠলো সুমিত। এখন ও কি করবে। এই প্রশ্নটা না করলেই ভালো হতো। যেন খুব জানা একটা ক্ষত খুঁচিয়ে দিয়েছে ও। হাত বাড়িয়ে টেবিলের উল্টোদিকে বসা রেণু মাথা ছুঁলো ও, 'রেণু, রেণু।'

বয় এসে দেখলো রেণু কাঁদছে। ও কি কিছু মনে করলো। বয়ের সামনে খুব গম্ভীর হয়ে থাকলো সুমিত। দুটো চা দিতে বললো।

শেষ পর্যন্ত রেণু বললো, 'আমি খারাপ, খুব খারাপ, না?'

এতোদিন বুকের মধ্যে যত রাগ ছিলো, যত জ্বালা তিল তিল করে বেড়ে গিয়ে মজা পুকুরের মত শ্যাওলায় ঢাকা ছিলো এক নিমেষেই তাকে সরিয়ে দিলো রেণু। কোনদিন দেখা হলে রেণুকে যেসব কটু কথা বলবে বলে একসময় ঠিক করেছিলো সুমিত তার একটাকেও এখন খুঁজে পেলো না। কি কথা বলবে ও, বুকের মধ্যে এতো কথা একসঙ্গে বেরিয়ে আসার জন্যে মুখিয়ে আছে, কোনটে দিয়ে শুরু করবে।

'আমাকে ঘেন্না করছো না তো! রেণু চোখ তুললো। দুহাত বাড়িয়ে রেণুর মুখ স্পর্শ করার লোভ হলো সুমিতের। হাতের তালুতে রেণুর নরম গাল মনে মনে অনুভব করলো ও। মুখে বললো, 'ছিঃ।'

'আমি কিন্তু এখনো তোমার আছি।' অন্যদিকে তাকিয়ে নিজের মনে যেন কথা বললো রেণু, 'এখনো ওকে স্পর্শ করতে দিইনি। আমি তোমার কাছে কোন কথা পাইনি, তবু—।'

এই প্রথম সেই কথাটা বলে ফেললো সুমিত, 'তুমি কেন বিয়ে করলে রেণু! আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারিনি। তোমার অতীতকে আমি সহজেই ভুলে যেতে পারতাম, যেমন তোমার এই বর্তমানকে একদিন ভুলে যাবো। কেন এরকম করলে?'

'আমি নিজেকে বুঝতে পারি না গো। একটা কিছু করার পর বুঝতে পারি এটা ভুল হলো। ভেবেছিলাম বাবা-মাকে সুখী করে যাবো। ভেবেছিলাম আমার অতীত যদি জানতে পারো তুমি হাত গুটিয়ে নেবে। আমি চট করে ভুলটা করে ফেললাম।' রেণু ওর দিকে তাকালো, 'এই, তুমি অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসনি আর?'

কেউ যেন কুচি কুচি করে দুটো চোখ কেটে দিতে চাইছে, সুমিত চোখ বন্ধ করলো, 'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি রেণু, জানি না কি আশায় তবু অপেক্ষা করে আছি।'

'আঃ', কি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললো রেণু। তারপর বললো, 'জানো, ও আমার অতীত খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি যা যা করেছি সব জেনে যাচ্ছে ও। তোমার কথা জানে না এখনো। তোমার কাছে যদি আসে কখনো—তুমি ফিরিয়ে দেবে তো?'

সুমিত কোন কথা বললো না। একথার কি জবাব দেবে ও।

হঠাৎ রেণু বললো, 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক দূরত্ব না?'

সুমিত হাসলো, 'আবার কবে আসবে?'

মাথা নাড়লো ও, 'জানি না। হয়তো একেবারে আসবো, হয়তো—। এই তুমি ভুলে যেতে পারো না আমাকে!' বড় বড় চোখ তুলে দেখলো ও সুমিতকে, 'তুমি খুব ভালো, খুব।'

'তোমাকে ও কি কষ্ট দেয়?' সুমিত জিজ্ঞাসা করলো।

মাথা নাড়লো রেণু, 'এসব জিজ্ঞাসা করো না তুমি, প্লিজ। আমার ব্যাপার আমি তোমাকে ভাবতে দিতে চাই না। এই তোমার অফিসের ফোন নম্বর আমাকে দেবে?'

দিয়েছিলো সুমিত। তারপর রেণু চলে গেলো। যাওয়ার সময় খুব ভীত এবং দেরী হয়ে যাওয়ায় ছোট্ট মেয়ের মত ছটফট করছিলো ও। সুমিত বুঝতে পারলো ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ও এমন করছে। কোন কথা বলা হলো না, অথচ কত কথা যে বলার ছিলো!

না, রেণু আর ফোন করেনি। কোন যোগাযোগ রাখেনি রেণু।

এক সময় মনে হয়েছে কি ছেলেমানুষী করছে ও। একটা মেয়ে তার বিবাহিত জীবন ছেড়েছুড়ে কি করে বেরিয়ে আসতে পারে? মনে মনে কতদিন অপেক্ষা করতে পারে ও। আর সেটা কেমন অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে না! কখন কেমন করে মনের মধ্যে দপদপ করা সেই উত্তেজনাটা কমে এলো একসময়, তলানির মত কোন কোণে চুপচাপ পড়েছিলো! হঠাৎ, হঠাৎ কোন মেয়েকে যার মুখের কোথাও বা হাসির ভাঁজে একটা চেনা চেনা ভঙ্গী এসে রেণুকে মনে করিয়ে দিয়ে যায়—এই পর্যন্ত। কিন্তু এটাও তো ঠিক, রেণু যদি সামনে এসে বলে, আমাকে নাও, সুমিতের সাধ্য নেই তা অস্বীকার করে। বুকের মধ্যে ভীষণ তৃষ্ণার্ত কেউ একজন আশায় আশায় বসে থাকে কেন এমন করে!

অথচ চিঠিটা পাবার পর নিজেকে কেমন নিঃস্ব মনে হয়েছিলো। একদম বিশ্বাস হয়নি দশপাতার শব্দগুলোকে। মনে হয়েছে নিজেকে আড়াল করার জন্য এভাবে কথার বর্ম পরেছে রেণু। বিয়ে করার সাফাই গাইবার জন্য এত কলঙ্কের অবতারণা। এগুলোকে মিথ্যে প্রমাণ করতে, চিঠির নামগুলো যাচাই করতে যাবে বলে ঠিক করেছিলো ও। মনের মধ্যে অবশ্য একটা ভয় উঁকি দিতো, যদি ঘটনাগুলো সত্যি হয়ে যায়! কেমন অসহায় লাগতো তখন। এক এক সময় মনে হয়েছে এইসব ঘটনা ভুলে গিয়ে ও স্বচ্ছন্দে রেণুকে গ্রহণ করতে পারে। রেণুর সঙ্গে দেখা করবে ও একাই, এইরকম যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তখন এক সন্ধ্যায় হোস্টেলে ওর ফোন এলো। ফোন ধরতেই শুনলো, খুব স্পষ্ট এবং চাপা গলা, 'এই, আমি রেণু!'

খুশীতে ফোনটা আঁকড়ে ধরলো ও, 'শোন, তোমাকে খুঁজেছিলাম আমি, বিশ্বাস করো, তোমাকে আমার খুব দরকার।'

'তুমি এসো, এখনই, সাতটার মধ্যে।' রেণুর গলাটা এমন কেন?

'কোথায়?' ভালো লাগছিলো সুমিতের।

'গড়িয়াহাটের মোড়ে যে বাটার দোকান আছে সেখানে।' রেণু কি ট্রাঙ্ককলে কথা বলছে? গলাটা এতো দূরের কেন?

'তুমি কোথেকে বলছো?'

'গড়িয়াহাট থেকে।' তারপর শব্দগুলো উচ্চারণ করলো ও, 'আজ আমার বিয়ে।'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো সুমিত, 'কি বলছ?'

'হুঁ লগ্ন সেই ভোর রাতে। আমি চুপচাপ বেরিয়ে এসেছি। তুমি এসো, প্লিজ একবার এসো।' ফোনটা নামিয়ে রেখেছিলো রেণু।

মুহূর্তেই ওপাশে সব থেমে গেলো, শুধু যান্ত্রিক শব্দ তুলে ফোনটা কেমন নিঃশব্দ হয়ে গেলো। টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে এলো সুমিত। রেণুর আজ বিয়ে। না, এ হতে দিতে পারে না ও। রেণুকে যদি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আজকের রাতটা যদি বাড়িতে ফিরতে না দেয়—বিয়ে ভেঙ্গে যাবে নিশ্চয়ই। জমানো টাকাগুলো পকেটে নিয়ে রাস্তায় নামলো ও। এখন ঘড়িতে ছ'টা। একটা বাস পেলে সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু বাস নয়, ট্যাক্সী খুঁজতে লাগলো সুমিত। আরো দ্রুত যাবে সময় নেই।

অনেক কষ্টে ট্যাক্সী পাওয়া গেল। উঠে বসেই হুকুম করলো ঝড়ের মতো চলতে। যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া ডানা মেলে উড়ুক—সুমিত সিটিয়ে বসে থাকলো। কিন্তু সামনে এতো গাড়ি কেন? কলেজ ষ্ট্রীট ছেয়ে আছে গাড়িতে গাড়িতে। ড্রাইভার বললো, 'জলুস হ্যায়।' পাগলের মত উসখুস করতে লাগলো ও। কারা দাবী জানাচ্ছে? কিসের দাবী? এখন ওদের চাহিদা নিশ্চয়ই সুমিতের চেয়ে বেশী নয়—হতে পারে না।

গড়িয়াহাটার বাটার দোকান যখন ও দেখতে পেলো তখন পনের মিনিট পেরিয়ে গেছে সাতটা বেজে। আর খুব স্বাভাবিক ঘটনার মত রেণু দাঁড়িয়ে নেই। বরং আর একটি মেয়েকে

দেখলো ও। ওকে কি জিজ্ঞাসা করবে রেণু কোথায় গেছে? ও কি রেণুকে দেখেছে? রেণু নিশ্চয়ই হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে যাবে। আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে কি এমন ক্ষতি হতো রেণু! তোমার জন্য আমি সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারি, তুমি সামান্য পনের মিনিট পারলে না! একবুক ভরা বন্ধ বাতাস নিয়ে সুমিত ট্যাক্সী ঘোরাতে বললো। বালীগঞ্জ স্টেশন রোডের দিকে যেতে যেতে রাস্তায় প্রতিটি মহিলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ও দেখছিলো। এর যে কোন একজন রেণু হয়ে যেতে পারে। আর তখন দরজা খুলে সুমিত বলবে, 'এসো!' আচ্ছা, আজ বিয়ের দিনে রেণু কোন শাড়ি পরে এসেছিলো? রেণু রেণু রেণু। মনে মনে ডাকছিলো সুমিত। ডাকার মত ডাকলে নাকি সব পাওয়া যায়। ঐ রাস্তায় এতো মেয়ে আছে তবে তারা রেণু নয় কেন? শেষপর্যন্ত বালীগঞ্জ স্টেশন রোডে গাড়িটা চলে এলো। আর হঠাৎ ও দেখলো এক লক্ষ দেওয়ালী নেমে গেছে বাড়িটায়। সানাই বাজছে। আস্তে আস্তে ট্যাক্সীটা বিয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে পার হয়ে এলো। সানাই-এর চড়া সুর যেন হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরে ছুঁড়ে দিলে দূরে—অস্পষ্ট হয়ে গেলো বিয়ে বাড়ি।

দুহাতে চোখ বন্ধ করে বসে থাকলো সুমিত। এখন কোথায় যাবে! যদি সোজা বিয়ে বাড়িতে ঢুকে যায়! অসম্ভব। রেণুর সঙ্গে কথা বলা যাবে না কিছুতেই। কিন্তু রেণুকে কি করে বাড়ির বাইরে আনা যায়! বিয়ের কনেকে! হঠাৎ ওর মনে পড়লো ঝুমার কথা। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সী ঘোরালো ও। এখন যদি ঝুমার কাছে গিয়ে ভিক্ষে করে, ওকে যদি অনুরোধ করে রেণুর বাড়িতে যেতে। একটি মেয়ে এবং রেণুর বন্ধু হিসেবে ঝুমা সহজেই ভেতরে যেতে পারে। গিয়ে বলতে পারে ট্যাক্সী নিয়ে সুমিত ওর জন্য অপেক্ষা করছে, ও চলে আসুক।

ছুটে যাওয়া কোলকাতার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে সুমিত বসে থাকলো ট্যাক্সীর জানালায়।

ট্যাক্সীর ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে ছেড়ে দিলো ও। একগাদা টাকা উঠেছিলো মিটারে। কিন্তু সুমিত সেসব খেয়াল করলো না। গ্রে ষ্ট্রীটে দাঁড়িয়ে মনে করতে চেষ্টা করলো ঝুমার বাড়িটা কোন দিকে! আবছা আবছা মনে পড়ছে। অশোক বলেছিলো হাতিবাগানে একটা ব্যাঙ্কের ওপর ওদের ফ্ল্যাট। মোড় থেকে একটু এগোতেই ও ব্যাঙ্কটা দেখতে পেলো। বাড়িটা দোতলা, তাই অসুবিধে হলো না কিছু। সিঁড়ি দিয়ে উঠে কলিং বেলে আঙুল রাখলো ও। হঠাৎ ওর মনে হলো এখানে আর কোন ব্যাঙ্ক নেই তো! যদি ঝুমাদের ফ্ল্যাট এটা না হয়! খুব অসহায়ের মত সুমিত বন্ধ দরজার দিকে তাকালো। ভেতরে মৃদু জলতরঙ্গের আওয়াজ উঠেছিলো বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর শব্দ না করে দরজা খুলে গেলো।

সুমিত দেখলো একজন মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরের ভিতর খুব জোরালো আলো জ্বলছে। চল্লিশের ওপাশে বয়স তবু মহিলাকে দারুণ দেখাচ্ছে। সুন্দর করে আটসাঁট শাড়ি পরেছেন উনি। নীলচে কাঁচের স্টাইলিশ ফ্রেমের চশমা গালের ফরসা চামড়ায় একটা আভা ছড়িয়েছে। স্লিভলেশ জামা থেকে বেরিয়ে আসা দুটো ডাটো হাত দরজা ধরে রেখেছিলো। খুব মৃদু স্বরে উনি বললেন, 'কাকে খুঁজছেন?'

সামান্য হাসবার চেষ্টা করলো ও, 'আমি সুমিত, ঝুমা আছে?

'সুমিট! টেনে টেনে বললো মহিলা। তারপর মাথা নেড়ে ওর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিলেন, 'আসুন।'

সুমিত ঘরে ঢুকতেই দরজা ভেজিয়ে বাঁ হাতে সোফাটা দেখিয়ে দিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বললেন, 'একটু বসুন।'

উনি চলে গেলে সুমিত সারা ঘরে ইন্টিমেটের গন্ধ পেলো। আঃ, এই গন্ধটা ওর দারুণ লাগে। রেণু ইন্টিমেট মাখে না!

ঘরটা ছিমছাম। পয়সা এবং রুচি থাকলে মানুষ এইভাবে ঘর সাজাতে পারে। পায়ের তলায় ভাজ করা পুরু কার্পেট। হাঁটলে

আরাম লাগে। এই মহিলা কে ? ঝুমার দিদি! যেই হোন না কেন বেশ একটা এয়ার নিয়ে ঘোরেন মহিলা।

পায়ের শব্দে মুখ ঘোরালো ও। এক মুখ হাসি নিয়ে ঝুমা ঘরে এলো, 'এই, তুমি! কি সৌভাগ্য আমার, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি।' উঠে দাঁড়িয়েছিলো সুমিত। ঝুমাকে দেখে ও একটু চমকে গিয়েছিলো। হালকা লাল রঙের হাঁটু অবধি ঝোলা নাইটি পরে আছে ও। মাথার খোলা চুল ফুলে ফেঁপে ঝরণার মত কাঁধ পিঠ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। শাড়ি পরলে ওকে যেরকম লম্বা দেখায় এখন তা দেখাচ্ছে না। খুব বড় ফুলের তোড়ার মত ওর জামার হাতা দুটো ডানার কাছে চেপে বসেছে। আর কি আশ্চর্য, ঝুমা ওকে তুমি বললো। এরকম অন্তরঙ্গভাবে কোনদিন কথা বলেনি ও। নাকি বাড়িতে হঠাৎ এসে পড়েছে বলে খুশীর ঘোরে তুমি বললো। ঝুমার শরীর থেকে চোখ সরিয়ে নিলো সুমিত, নিজেকে কেমন পাপী পাপী মনে হয়। ও শুনলো ঝুমা বলছে, 'মণি, এ হোলো সুমিত, আমাদের সঙ্গে পড়ে—খুব লাজুক ছেলে, খুব।'

হেসে ফেললো সুমিত। ওকে কেউ লাজুক ছেলে বলেনি কখনো আর ঝুমা পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বোধহয় ওর সম্বন্ধে এই কথাটাই খুঁজে পেলো। হাত জোড় করে ঝুমার পেছনে দাঁড়ানো সেই মহিলাকে নমস্কার করলো সুমিত। ওঁকে ঝুমা মণি বলে ডাকলো। মণি মানে ?

ভদ্রমহিলা হাসলেন। দাঁতের গড়ন ভালো—সুমিত দেখলো। ঝুমা ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার বন্ধু এবং মা, বুঝলে ?'

ঝুমার মা বললেন, 'বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?'

'না না এখানে বসবে না, চলো আমার ঘরে চলো।' এক হাতে দরজার পর্দা ধরে সুমিতকে ডাকলো ঝুমা। ঝুমার ঘরে যাওয়া কি শোভনীয় হবে! কিন্তু ও যে সহজ ভঙ্গীতে ডাকছে—সুমিত ওর পেছন পেছন চলে এলো। ছোট করিডোর, দুপাশে ঘর। ঝুমার ঘর শেষপ্রান্তে।

ঘরে ঢুকে ঝুমা বললো এখন বলো কি খবর ?'

'একটু প্রয়োজন ছিলো। সুমিত সোফা-কাম-বেডে হেলান দিয়ে বসলো, 'তুমি কেমন আছো ?'

'আমি আজ ভীষণ টায়ার্ড ! খুব ঘুরেছি। দুপুরে বেরিয়েছিলাম ব্যাণ্ডেল চার্চ দেখতে, ফেরার সময় হাওড়া স্টেশনে যেতে হলো অশোককে সি-অফ করতে।' খাটের ওপর বসে দুটো হাতে দুদিকে ভর দিয়ে মুখ ওপরে তুলে বললো ঝুমা।

'অশোক, অশোক আজ চলে গেলো !' কথাটা বলেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো সুমিতের। ইস, একদম খেয়াল ছিলো না। অশোক চলে যাচ্ছে এটা কেমন করে ভুলে গেলো ও। ঝুমার দিকে তাকালো সুমিত। অশোকের চলে যাওয়া ওর মনের ওপর কোন ছাপ ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে না। কি সহজে ও সি-অফ করতে স্টেশনে গিয়েছিলো। ব্যাণ্ডেল চার্চে কি ও একা যেতে পারে। পাগল ! মাথা পেছনে হেলানো, কাঁধদুটো সামান্য উঁচু, হাতের ওপর শরীরের ভর—হালকা নাইটির মধ্যে দিয়ে ওর ভারী বুক পতাকার মত নড়ছে। ওখানে তো অশোকের জন্য কোন কষ্ট নেই। নেই ?

মাথা নামালো সুমিত। আর সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলো ঝুমা, 'এই তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো এতে ?' সুমিত দেখলো ঝুমা দু আঙুলে কোমরের কাছ থেকে জামাটা তুলে ধরে ওকে জিজ্ঞাসা করছে।

'না।' বলে সুমিত হাসলো। কি বলা যায় আর !

গুড। বলো প্রয়োজনটা কি !'

একটু উসখুস করলো সুমিত। কি ভাবে বলা যায় কথাটা। ঘড়ির দিকে তাকালো, নটা বাজে। ঝুমা বলছে খুব টায়ার্ড। কথাটা ও কিভাবে নেবে। সুমিতের মুখ দেখে কিছু আন্দাজ করে ঝুমা খাট থেকে নেমে এসে ধপাস করে ওর পাশে বসে পড়লো। একটা পা ভাঁজ করে সোফার ওপর তুলে ওর দিকে ফিরল ঝুমা, 'সিরিয়াস কিছু ?

সুমিত দেখলো নাইটি থেকে বেরোনো ঝুমার পুরু পায়ের গোছা কি সাদা আর তাতে নরম সিল্কের মত ছোট ছোট লোম শুয়ে আছে ছড়িয়ে ছড়িরে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো, তাড়াতাড়ি বলে ফেললো ও 'তুমি জানো আজ রেণুর বিয়ে? কথাটা বলার পর খেয়াল হলো ও ঝুমাকে তুমি বললো। বলে ফেললো।

'বিয়ে, ওঃ, তাই নাকি!' কেমন চমকে ওঠা গলায় বললো ঝুমা।

'হুঁ। আমাকে আজ সন্ধ্যের সময় হঠাৎ ফোন করে দেখা করতে বললো রেণু। আমার দেরি হয়েছিলো—দেখা পাইনি। আমি কি করবো বুঝতে পারছি না ঝুমা। তুমি একবার যাবে? যদি এখনো হয়—আমি বাইরে অপেক্ষা করবো—আমি—।' কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেলো সুমিত।

'লগ্ন কখন?' ঝুমা জিজ্ঞাসা করলো।

মাথা নাড়লো সুমিত, বোধ হয় ভোরের দিকে।'

হঠাৎ ঝুমা হাত বাড়িয়ে সুমিতের চুলে আঙ্গুল রাখলো। 'তুমি খুব দুঃখ পেয়েছো না? এখন ওখানে যাওয়াটা নেহাৎই ছেলেমানুষী, এটা বুঝতে পারছো না?'

'আমি পারছি না।' সুমিতের বুকের মধ্যে সন্ধ্যের পর এই প্রথম একটা কান্না চুপিচুপি বড় হয়ে উঠছিলো।

'এই, ছেলেমানুষী করো না। দেখছো না রেণু তোমাকে কি সহজে ভুলে গেলো। তুমিকেন পারবে না! আর তুমি তো রেণুর প্রথম নও। বোকার মতন মন খারাপ করো না। ছিঃ, তুমি তো পুরুষ মানুষ।' ঝুমার আঙ্গুলগুলো সুমিতের চুলের মধ্যে সাঁতার কাঁটছে। অন্য হাতে ঝুমা ওর কাঁধ ধরলো, 'একদম বাচ্চা ছেলে তুমি। স্পোটসম্যান হও। ভাবো না একটা ম্যাচ হেরে গেলে। এই সুমিত—আবার চোখ থেকে জল ফেলছো—ছিঃ। এই বোকা।

ঝুমার বলার মধ্যে এমন একটা মমতা ছিলো, এমন একটা সুর ছিল যাকে মা মা মনে হয়, সুমিত নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না আর। ছোট্ট ছেলের মত ও ঝুমাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে

কেঁদে ফেললো। এতদিন বুকের মধ্যে তিল-তিল করে জমা পড়েছিলো, যা এক নিমেষে কেমন করে তার বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। ঝুমার বুকে মুখ রেখে ও পবিত্র নদীর মত ময়লাগুলো ধুয়ে ধুয়ে নিচ্ছিলো। দু হাতে সুমিতের মাথাটা বুকে চেপে ধরে ঝুমা ফিসফিস করে বলছিলে, 'এই তুমি কাঁদবে না, কেন চোখের জল ফেলছো! আমাকে ত্থাখো না, আমি তো একবারও কাঁদিনি, আমি তো কেমন হাসি মুখে বিদায় দিয়ে এলাম। এই বোকা তুমি একদম বোকা— আমাকে ত্থাখো না। আমি তো একটা মেয়ে—আমি যদি পারি তবে তুমি পারবে না কেন? ঝুমার গলাটা কেমন করে এক সময় বুঁজে গেল, ওর ঠোঁট নড়ছিলো, সুমিতের মাথার ওপর গাল রেখে হু হু করে কেঁদে ফেললো ঝুমা।

ঝুমার ওখানে আর যাওয়া হয়নি। একএকবার মনে হয়েছে গিয়ে দেখা করি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পা আড়ষ্ট হয়েছে, মনের মধ্যে কি সঙ্কোচ চেপে ধরেছে হঠাৎই। আর আশ্চর্যের ব্যাপার ঝুমাও কোন যোগাযোগ করেনি। যেন সেই রাত্রে হঠাৎই একটা কিছু ঘটে গেলো, যা তারপর আর মনে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। দীপকবাবু কাল রাত্রে বললেন, ঝুমা নাকি রেণুকে কি সব বলেছে। কি বলতে পারে ঝুমা। সেই রাত্রে ও তো কোন অন্যায় করেনি যা রেণুকে কিছু বলতে পারে। রেণু কি ঝুমাকে ফোন করেছিলো! ওকে ফোনে না পেয়ে ঝুমার সঙ্গে কথা বলেছিলো? আর সে কথা শুনে রেণু ফিরে গেলো বরেনের কাছে? কেমন অসম্ভব লাগছে এইরকম ভাবতে—কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য সব কিছুই কি যুক্তিনতন চলে? ঝুমার সঙ্গে কি ও দেখা করে জিজ্ঞাসা করবে? কোন মানে হয় না।

রেণুর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সুমিত ভেবেছিলো ওর ছবি এবং চিঠিগুলো রাখার কোন যুক্তি নেই—নেহাৎই ভার বয়ে বেড়ানো। ঠিক সেই সময় ওর হঠাৎ মনে হলো রেণুর চিঠিটা কতদূর সত্যি একবার খোঁজ নিলে হয়। এমনভাবে লিখেছে রেণু, খোঁজ পেতে

কোন অসুবিধে হবে না। অশোক তখন হায়দ্রাবাদে, ও সঙ্গে থাকলে ভালো হত। শেষপর্যন্ত একাই যাওয়া ঠিক করলো সুমিত।

প্রথম নাম রমেন রায়। বালীগঞ্জ স্টেশন রোডে এক বিকেলে গিয়ে বিপ্লবের দেখা পেয়ে গেল সুমিত সেই চায়ের দোকানে। সুমিত খুশী হলো ছেলেটা ওকে চিনতে পেরেছে। অশোকের কথা বললো সুমিত। তারপর এলোমেলো কথা হওয়ার পর বিপ্লব বললো 'আপনাদের সেই ক্যাণ্ডিডেটের তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে, জানেন নিশ্চয়ই।'

সুমিত ঘাড় নাড়লো।

'কিন্তু মনে হয় কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে বিয়ের পর। খবর-টবর তো ও বাড়ি থেকে বেরোয় না। তবে আমরা আর মেয়েটাকে বাপের বাড়ি ফিরে আসতে দেখিনি।' বিপ্লব বললো।

শেষ পর্যন্ত সুমিত জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা, এখানে রমেন রায় বলে কেউ থাকে ?

'রমেন ?' চোখ ছোট করলো বিপ্লব, 'ওকে চিনলেন কি করে ?'

অস্বস্তিতে পড়লো সুমিত, শেষপর্যন্ত বললো, 'শুনেছি রেণুর সঙ্গে নাকি কিসব ছিলো ওর।'

হেসে ফেললো বিপ্লব, 'কি মশাই, খুব ইণ্টারেস্টেড মনে হচ্ছে আপনাকে! রমেনের এখন মিসা হয়ে গেছে।'

বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো সুমিতের, কথাটা হুবহু মিলে গেলো।

বিপ্লব বললো, 'শুনেছি আগে নাকি খুব সোস্যাল ছিলো, পাড়ায় ফাংশন টাংশন করতো। রেণুর সঙ্গে বোধহয় বাচ্চাদের আসর করতে গিয়ে ভাবটাব হয়েছিলো। একটা ব্যাণ্ড পার্টি হয়েছিল ক্লাব থেকে। রমেন তার চার্জে ছিলো। তারপর একদিন বেপাত্তা হয়ে গেলো ও। আমি এ পাড়ায় আসার পর ও আবার ফিরে এলো। সে কি ডাঁট তখন রমেনের। মোটর বাইকে করে ঘোরে, জামাকাপড় দেখলে চোখ বড় হয়ে যাবে আপনার।

শেষপর্যন্ত আমরা খবর পেলাম ও ওয়াগন ব্রেকার পার্টি করেছে। পলিটিক্যাল পার্টিতেও ভিড়েছে। কিন্তু সামলাতে পারেনি, একদিন পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেলো, শুনেছি মিসায় আছে।'

আর কিছু দরকার নেই। বিপ্লবের বর্ণনা হুবহু না হোক রমেন রায়ের চরিত্রটা রেণুর চিঠির পাতায় এরকমই হয়ে আছে। রেণু এক ফোঁটা বাড়িয়ে বলেনি। এই ছেলেটিকে কল্পনা করে রেণু মিথ্যে কুৎসার কাদা নিজের গায়ে মেখে চিঠি লেখেনি। ওর পেছনে সবটাই সত্যি হয়ে আছে।

কিন্তু এতো কথা জানার পরও রেণু সম্পর্কে কেন খারাপ ভাবনা মনে আসছে না। সব পেয়েছির আসর করতে গিয়ে যেকোন বাচ্চা তো তাদের নেতাকে নায়ক বলে ভাবতে পারে। অবশ্য তখন কি রেণু বাচ্চা ছিলো। রেণু তো স্পষ্ট করেই লিখেছে যদিও ফ্রক পরতো তবে ও মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের কথা মতন এটাও তো ঠিক, ওয়াগন ব্রেকার রমেন রায়ের সঙ্গে রেণুর কোন সম্পর্ক ছিলো না। তবে ?

রমেন রায়ের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে না ফেলতেই সুমিত সেই উড়োজাহাজ কোম্পানীর অফিসটায় গিয়ে হাজির হলো। যেসব প্রাইভেট সংস্থা দেশের অভ্যন্তরে যাত্রীপরিবহণ করে এদের অবস্থা তাদের মধ্যে সবচেয়ে রমরমে। বিভূতি গাঙ্গুলীর খবর পেতে অসুবিধে হলো না কিছু। বাড়ির ফোন নম্বরটাও পেয়ে গেল অফিস থেকেই। বিয়ের জন্য মাসখানেক ছুটি নিয়েছে বিভূতি।

অফিস থেকে বেরিয়েই সুমিত একটা পাবলিক বুথে ঢুকে ফোন করলো। এখন দুপুর। ওপাশে ফোন বাজছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেলো কারোর ধরার নাম নেই। বিরক্ত হয়ে রেখে দেবে ভাবছিলো এমন সময় ওপাশে একটা ঘুম জড়ানো গলা শুনতে পেলো।

'হু ইজ দেয়ার ?'

নম্বরটা যাচাই করে নিলো সুমিত। হ্যাঁ ঠিক জায়গায় ফোন করেছে ও।

'বিভূতি গাঙ্গুলী আছেন ?'

'স্পিকিং।' গলার স্বর কি ঘুমজড়ানো—না মাতাল মাতাল ?

'আপনি আমায় চিনবেন না। অপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' সুমিতের গলা একটুও কাঁপলো না। সব মিলে যাচ্ছে যে—কি আশ্চর্য !

'বলুন !'

'আপনি রেণুকে চেনেন ?'

'কোন রেণু ? 'হু ইজ শি ?' ওপাশের গলায় বিস্ময়।

'রেণু রায় !'

খানিক চুপচাপ, তারপর প্রশ্ন হলো, 'আপনি কে ?'

'ওর বন্ধু।'

'কি হয়েছে রেণুর ?'

'তেমন কিছু নয়। আমি নেহাতই কৌতূহলে আপনাকে ফোন করছি। আপনি ওকে কতটা চেনেন !'

'ভাই এ কথার উত্তর দেবো কি করে ! আপনাকে আমি চিনি না জানি না, প্লাস, আপনার মুখ দেখতে পাচ্ছি না আমি। ইয়েস ওকে আমি চিনতাম। আর ইন এ শর্টকাট, ও খুব ভালো মেয়ে। তার বেশী জানবার আগ্রহ যদি থাকে সরাসরি চলে আসুন এখানে। দুপুরবেলায় নয়—এই সময় আমি এবং আমার স্ত্রী খুব ব্যস্ত থাকি, আজ যেমন ছিলাম।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলো সুমিত, শুনলো একটি নারীকণ্ঠ কেমন আবদারে গলায় বললো, 'উম্, প্লিজ বি কুইক !' আর সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো।

ইন এ শর্টকাট, ও খুব ভালো মেয়ে। কথাটা মনে মনে বললো সুমিত। অর্থাৎ জলজ্যান্ত বিভূতি গাঙ্গুলী, চিঠির পাতায় নন, বাস্তবেও বেঁচেবর্তে আছেন এবং এই মুহূর্তে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যস্ত। ওর মনে হলো বিভূতি গাঙ্গুলীর কথা বলার মধ্যে কোন সঙ্কোচ ছিলো না, হয়তো ওর স্ত্রী পাশেই, বিছানায় শুয়ে সব শুনেছিলো কিন্তু তার

জন্যে ও এক ফোঁটা বিব্রত হয়নি। অন্তত ওর গলায় তা মনে হয়নি। অথচ একদিন দিনের পর দিন ও রেণুকে গাড়িতে নিয়ে ঘুরেছে (রেণুর চিঠি যদি সত্যি হয়)। এবং এখন সুমিতের মনে হচ্ছে তা না হবার কোন কারণ নেই। এইসব লোক নিজেদের অতীতের কথা বলতে বোধ হয় কোন দ্বিধা করে না। সুমিতের ভয় হলো, ও যদি বিভূতি গাঙ্গুলীর বাড়িতে কখনো যায় তাহলে বিভূতি নিজের বৌ-এর পাশে বসে রেণুর সবকথা বলে যাবে। আর হয়তো সেইসব কথাগুলো সহজ হবে না, এমনকি রেণু যা লিখেছে তার বাইরের কথাও তো থাকতে পারে যা আরো মারাত্মক চেহারার? অতএব সে সবে না গিয়ে ওর মতো করে বলাই ভালো, ইন· এ শর্টকাট, ও খুব ভালো মেয়ে।

পরপর দুটো চরিত্র মিলে যাবার পর সুমিত হাল ছেড়ে দিলো। ওর মন এখন বলছে রেণুর চিঠিটা সত্যি, ভীষণ রকমের সত্যি। এই বড় রকমের সত্যি চিঠি রেণু কেন লিখলো? নিজেকে এভাবে নগ্ন করে দিতে কোন মেয়ে চায় কি? বুকের মধ্যে রেণুকে জড়িয়ে ধরে সুমিত একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলো, এই, আমি তোমার কে?' মুখ নামিয়ে চোখ বন্ধ করে রেণু বলেছিলো, পতি দেবতা গো! সেই মনের টানে কি চিঠিটা লিখে ফেলেছিলো রেণু?

এখন চিঠিটা নিয়ে ও কি করবে? সত্যি কি এর কোন মূল্য আছে ওর কাছে? না নেই। যাকে ও ভালবাসতো (তো?) তার চেহারা তো ওর কাছে এক এক রকমের হতে পারে না। এ চিঠি নিয়ে ও রেণুর সামনে দাঁড়াতে পারবে না, বলতে পারবে না, দ্যাখো, আমি তোমার সব জানি, তুমি যদি আমার কাছে না ফিরে আসো আমি তোমার সর্বনাশ করবো। এ চিঠি দিয়ে ও রেণুর স্বামীকে খুশী করতে পারবে না, দু-হাত ভরে সেই ভালবাসার ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে না! শুধু কিছু বিশ্রী রকমের ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকা চিঠিটাকে বয়ে বেড়িয়ে লাভ কি!

রেণু আজ ফিরে গেছে বরেনের কাছে। অথচ ওর স্বামী

নিশ্চয়ই ওর ওপর অত্যাচার করেছে। প্রশ্নটা সেদিন যদিও এড়িয়ে গেছে রেণু কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়নি একটুও। তবু ফিরে গেলো! ওর কি মনে হয়েছিলো সুমিত বিশ্বাসঘাতকতা করবে? না হলে ও ভাইদের পাঠিয়েছিলো কেন এই চিঠি আদায় করতে? কেন ঝুমাকে ফোন করতে গেলো! কই, একবারও তো বাপের বাড়ি ফিরে এসে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারলো না! বিশ্বাসের ভিতটা এতো সহজে নড়ে গেলো কি করে! আবার দীপকের কথা মতন সুমিতের মার খাওয়ার কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিলো রেণু। কেন?

রেণু, তোমাকে আমি আজও বুঝতে পারলাম না। মাঝে মাঝে আমি আমার মনকেও বুঝতে পারি না, তবু তুমি যখনই যেভাবেই হোক আমার কাছে যদি ফিরে আসো তোমাকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই। রেণু, তুমি আমার রক্তের মধ্যে মিশে গেছ—রক্ত কি করে ধুয়ে ফেলতে হয়? আমি জানি না।

ছবির ফ্রেমের চৌহদ্দিতে সুমিত নিজেকে হাসতে দেখলো। হাত বাড়িয়ে ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নিলো সুমিত। ছবির পেছনেই সেই খামটা। যার মূল্য কা'রো কাছে অনেক, ওর কাছে কানাকড়িও নয়। এই চিঠিটাও তো রেণুর বিয়ের দিনেই ও ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারতো। ও যে ছেঁড়েনি সেটাই বা রেণু বুঝলো কি করে! মেয়েরা কি করে এইসব গোপন ইচ্ছার কথা জানতে পারে যা ছেলেরা খুব অবচেতন ভাবে করে যায়। কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে কি না, না দেখেই একটি মেয়ে বলে দিতে পারে। ওর অনুভূতি সে কথা বলতে সাহায্য করে। একটা ছেলেকে এক পলক দেখেই ওরা তার মনের গভীরে সব কিছু ডুবুরীর মত আঁতিপাঁতি করে খুঁজে ফেলে। তাহলে আমাকে তুমি বুঝতে পারলে না কেন রেণু?

খাম থেকে ফটো আর চিঠিটা বের করলো সুমিত। ছবিটার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলো ও। বন্ধ চোখের পাতায় এখন

রেণু। প্রতি রেখা স্পষ্ট, সকালের পুজো পুজো রোদ্দুর, স্নিগ্ধতায় মাখামাখি।

এতদিনের চিঠি, ভাঁজ খুললেই যেন রেণুর হাতের গন্ধ পাওয়া যায়।

'আমার বিয়ের খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছো এতক্ষণে, দিনটা এসে গেল বলে। এখন আমার বাড়ির সব ঘরে ব্যস্ততা, যাকে ঘিরে এতো আয়োজন তার দিকে তাকাবার সময় নেই কারো। বিয়ের কনে নাকি আমি, এই অজুহাতে বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ। (দ্যাখো, কি সহজে এই কথাগুলো লিখে ফেললাম আমি। অথচ তোমরা চলে যাওয়ার পর কতবার শুধু ভেবেছি, আর ভেবেছি)।

কি ভাবছো ? আমার সেই কথাগুলো এতদিনে সত্যি হোলো ? সেই যে আমি তোমাকে বলতাম আমি খারাপ, খুব খারাপ ! তখন তো তুমি এমন করে তাকাতে যেন আমি খুব ছেলেমানুষ। কি, এখন তো কথাগুলো সত্যি হলো ? তোমার বিশ্বাস ভুল প্রমাণ করবার জন্য কেমন সত্যি করে ফেললাম।

সুমি, তুমি খুব ভালো। প্রথম দিনেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে তুমি খুব ভালো। তোমার জীবনে আমার মতন করে কেউ আসেনি। ভয় হতে লাগলো, সেই সঙ্গে লোভ। নিজেকে সামলাতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত। তোমার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে মনে হতো তোমাকে সব বলি, খোলামেলা কথা বলে ফেলি, তারপর যা হবার হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় হতো, তোমাকে হারাবার ভয়। বিশ্বাস করো, তোমাকে একদিন না দেখলে আমার সবকিছু মিথ্যে হয়ে যেতো। আর এখন তো, দ্যাখো কত সহজে তোমাকে যাতে কোনদিন না দেখতে হয় তার ব্যবস্থায় হাত মিলিয়েছি। বল, আমি কেমন মেয়ে ?

ভালবাসার কাঙাল ছিলাম আমি। এক একজন মানুষের রক্তই বোধহয় এরকম হয়। তুমি বলতে আমি নাকি সুন্দর। একথা

তো অনেকেই বলতো। সেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি কথাটা। শুনতে শুনতে, জানো, বড় অহঙ্কার হতো। মনে হতো আমি যা চাই তাই পাবো। তাই রমেনদা যখন সব মেয়ের মধ্যে আমাকে বিশেষ রকমের খাতির করতে লাগলো তখন মনে হয়েছিলো এটাই আমার পাওনা। এবং ন্যায্য। রমেনদা আমাকে ভালোবাসুক।

অথচ তখন আমার কত বয়সই বা ছিলো? এগার কিংবা বারো। না তার বেশী নয়! (কারণ একটা ব্যাপারে এটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখনই আমি ছোট্ট মেয়ে থেকে নারী হয়ে গেলাম একদিন, আচমকা)।

আমাদের পাড়ায় একটা সব পেয়েছির আসর ছিল। বাচ্চাদের খেলাধুলো, ড্রিল, এসব হতো। একদিন আমি নাম লেখলাম তাতে। আমার দাদাই বাবার সম্মতি নিয়ে কাণ্ডটা করেছিলো। তখন তো আমি নেহাৎই বাচ্চা। কিন্তু ঐ বয়সেই যে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিলাম সেটা হলো ছেলেদের চোখ। কোন ছেলে একবারের বেশী দুবার তাকালে আমরা মেয়েরা তা নিয়ে হাসাহাসি করতাম। আর আমার মনে হতো আমাকে দেখছে। আমি যে একটা দেখার মত জিনিস (শব্দটা খুব খারাপ)। এটুকু জানতে পেরে খুব আনন্দ হতো গোপনে গোপনে। সবতো পরিস্কার বুঝতাম না, তবু মনে হতো আমি বেশ দামী। ফ্রক পরতাম তখন। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, অল্প বয়সী ছেলেরা যখন তাকাতো তখন ওরা আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। খারাপ লাগতো না আমার। না দেখার ভাণ করতাম। কিন্তু বড়রা, বিশ্বাস করো, তাদের আমার মত ছেলেমেয়ে ছিলো, আমার পায়ের দিকে কেমন চোখে তাকাতো। স্বাস্থ্য আমার বরাবরই ভালো, বেশী রকমের। দশ বারো বছরেই পা দুটো কেমন ভারী ভারী লাগতো। ফ্রক পরতাম হাঁটু অবধি। কিন্তু ঐ বুড়ো চোখগুলো সেদিকেই তাকিয়ে থাকতো। এমন বিশ্রী লাগতো না!

আর সেই সময়েই রমেনদাকে দেখলাম। রমেন রায় বালীগঞ্জ স্টেশন রোডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে। দূর থেকে দেখেছি। কৌতূহল হয়নি কিছু। সে’বয়সই আমার ছিলো না। আসরের দায়িত্ব নিয়ে এলো ও। উনিশ কুড়ি বছর বয়স হবে। আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু বেশ লম্বা, সুন্দর স্বাস্থ্য। গেঞ্জি আর হাফ-প্যাণ্ট পরে যখন আমাদের এক্সারসাইজ শেখাতো তখন কি ভালোই না লাগতো। সেই রমেনদা প্রথমদিন আমাকে বলেছিলো, ‘তুমি কি বাঁশি বাজাতে পারবে? অত সুন্দর ঠোঁট।’ কিছু না বুঝে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলাম। রমেনদার ব্যাণ্ড পার্টিতে আমি থাকবো না, ভাবতেই শরীরটা কেমন করে উঠেছিলো। ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, পারবো। ‘গুড’। হেসে বলেছিল রমেনদা। কথাটা অন্য কোন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেনি, শুধু আমাকে। মনে মনে আওড়াচ্ছিলাম, কি সুন্দর ঠোঁট-কি সুন্দর ঠোঁট। সত্যি এরকম করে তো জানতাম না। বাড়ি ফিরে আয়নায় দেখলাম নিজেকে। মনে হলো সত্যি তো আমার ঠোঁটটাকে সুন্দর দেখাচ্ছে! ছেলেরা এমন করে বললে যে সবকিছু অন্যরকম হয়ে যায় সেই প্রথম টের পেলাম।

আমি বেশী কথা বলতাম না। কেমন লজ্জা করতো। কিন্তু রমেনদা যখনই আমাদের বোঝাতো তখন আমারি মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতো। সে, কি করে বিউগল বাজাতে হবে তা থেকে শুরু করে সব কিছু। যেন আর কেউ সামনে নেই আমি ছাড়া। এমন লজ্জা লাগতো না! রাগও হতো! সবার সামনে আমার দিকে তাকাবার কি আছে! দু-একজন বন্ধু টের পেয়ে গিয়েছিলো বোধহয় একজন বললো, ‘রমেনদা তোর লভে পড়েছে।’ বিশ্বাস করো কথাটা সেই প্রথম শুনলাম। লভে পড়লে বুঝি ওরকম করে তাকাতে হয়। তারপর সেই বন্ধু বললো, ‘মীরাদি যদি শোনে না তোকে খেয়ে ফেলবে।’ আমি বললাম, ‘কেন?’ ও বললো, ‘মীরাদি তো অনেকদিন রমেনদার লভে পড়ে আছে।

রমেনদা যে পাত্তা দেয় না।' মীরাদিকে আমি চিনতাম। আমার চেয়ে অনেক বড়। শাড়ি পরে। মুখটা এখন মনে পড়ে না, তবে তোমরা ছেলেরা যা চাও (এই, তোমার কথা বলছি না) সেই বুক ছিল খুব ভারী। বাড়ির লোহার গ্রিলে বুক চেপে রমেনদার ড্রিল করানো দেখতো মিরাদি। মীরাদির বুকের দিকে চাইতে আমাদের লজ্জা করতো।

না, মীরাদি আমাকে কোনদিন কিছু বলেনি। বোধহয় শোনেনি কিছু। আমি কিন্তু সেই বন্ধুর কথা শুনে মনে মনে এগিয়ে গেলাম অনেক। অত বড় মীরাদিকে হারিয়ে দিয়ে রমেনদার দৃষ্টি আমার দিকে টানতে পেরেছি বলে একটা অবোধ্য আনন্দ হচ্ছিলো। সেই সময় একদিন আমি নারী হয়ে গেলাম। লজ্জায় ভয়ে সে আমার কি কান্না। মা যত বোঝায় এ কিছু নয়, প্রত্যেক মেয়ের এটা হবেই, এটা না হলেই বরং মেয়ে হওয়া যায় না—তত কাঁদি। আসলে বোধহয়, এখন মনে হয়, সেই সময় আমি বুঝে গিয়েছিলাম এখন আমার সবকিছু পালটে যাবে। এখন আমি আর দৌড়ে গিয়ে রমেনদার ড্রিল পার্টিতে দাঁড়াতে পারবো না। নিষেধের প্রাচীরটা আচমকা তুলে দিলো খানিকটা রক্তপাত। আমাকে বাড়ির জানালায় লোহার শিকে গাল চেপে ওদের দেখতে হবে মীরাদির মত। আর ব্যাপারটাও হলো তাই। আমার আসরে যাওয়া বন্ধ হলো। কিন্তু মনে মনে ভীষণ ছটফট করতাম। ভাবতাম রমেনদা নিশ্চয়ই আসবে আমার খোঁজ নিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আসরের বিকেলবেলায় ড্রিল, ব্যাণ্ড বাজানো বন্ধ হয়ে গেলো কেন? বন্ধুরা খবর দিলো, রমেনদার অসুখ হয়েছে। খুব খারাপ লাগতে আরম্ভ করলো, শেষ পর্যন্ত একদিন দুপুরে গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়িতে। কেমন যেন একটা ভূত আমাকে টেনে নিয়ে গেলো ওখানে। রমেনদার দাদা সন্ন্যাসীগোছের মানুষ, বিয়ে করেনি, আর আছে বুড়ি মা। অতএব আমার অসুবিধে হলো না কিছু। গিয়ে দেখি শুয়ে আছে ও, তিন চারদিনের দাড়ি গাল ভর্তি আর কি ভীষণ

রোগা হয়ে গেছে। আমাকে দেখে হাসলো, বুঝলাম খুশী হয়েছে, দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে?'

ও আস্তে আস্তে বললো, 'সুখ।'

'সুখ?' আমি বুঝতে পারছিলাম না।

ও বললো, 'তুমি এলে, তাই।'

বিশ্বাস করো, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো। জীবনে সেই প্রথম শরীর কেমন করে কদমফুল হয়ে যায় বুঝতে পেরেছিলাম। কাছে ডাকলো রমেনদা, এতোদিন কোথায় ছিলে? আসরে আর আসবে না?'

আমি মাথা নেড়ে না বললাম।

'কেন?' প্রশ্নটা করেই যেন বুঝতে পেরেছিলো রমেনদা, 'পাগল! তাতে কি হয়েছে? তুমি না এলে আমার খারাপ লাগে।' আমি তখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে। রোগা হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরে মুখের সামনে ধরলো। তখনো ওর জ্বর ছিলো গায়ে, আমার হাতে গরম ভাব লাগলো। হঠাৎ আমার হাত নিজের মুখের ওপর চেপে ধরে চুমু খেলো রমেনদা। আর তক্ষুনি আমার মনে হলো আমার শরীরের ভিতরে এমন একটা ঘর ছিলো যার খবর আমি জানতাম না, এখন এই তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ মুহূর্তেই তার দরজা খুলে দিলো। আমি কি সুখে চোখ বন্ধ করে সেই ঘরটাকে দেখছিলাম হঠাৎ পায়ের শব্দে চোখ খুলে দেখি মীরাদি দরজায় দাঁড়িয়ে কেমন করুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম আমি, এক দৌড়ে চলে এলাম ওখান থেকে, একেবারে বাড়িতে এসে নিঃশ্বাস ফেললাম, কিন্তু স্বস্তি পেলাম না। নিজের কাছেই নিজের কেমন লজ্জা হতে লাগলো।

তারপর একদিন শুনলাম পাড়ায় একটা বাজে ছেলে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, বালিকা জানে না ও মরে গেছে। সুর করে বলতো। কিন্তু এতদিনে আমার শৈশব যে সত্যি সত্যি মরে গেছে, জ্ঞানবৃক্ষের আপেলটা খেয়ে ফেললাম যে। কিন্তু আমাদের আসর

আর জমলো না। অসুখ সারার পর রমেনদাকে একদিন মাত্র দেখেছিলাম জানলায় বসে। কেমন মায়া লেগেছিল, কথা বলতে পারিনি। তারপর শুনলাম রমেনদা হঠাৎ কোথায় চলে গেছে। দুঃখ পেয়েছিলাম কি? জানি না। তবে কেমন শক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। জানো, এই ঘটনা আমি কখনো ভুলতে পারিনি। জানি, এটা খুব সাধারণ, হয়তো রমেনদার কোন টান ছিল না আমার ওপর, আমি তো তখন একদম ছেলেমানুষ, তবু ভুলতে পারা গেলো না যে কিছুতেই। সেই রমেনদা যখন আমি একদম পুরোপুরি যুবতী মেয়ে, ফিরে এলো মোটরসাইকেলে চেপে। সাজগোজে চেনা যায় না। দু-একদিন রাস্তায় দেখা হলে হেসেছে ওই পর্যন্ত। আমি কিন্তু কোন আকর্ষণ বোধ করিনি ওকে দেখে। সেই চেহারাটা হারিয়ে ফেলেছিলো রমেনদা। শুনলাম পুলিশ নাকি ধরে নিয়ে গেছে ওকে, ওয়াগন ভাঙ্গত। আমার একবিন্দু খারাপ লাগেনি, সত্যি বলছি।

স্কুলে যখন ওপরের ক্লাশে পড়ছি তখন অনেকের মুগ্ধ দৃষ্টি যাতায়াতের পথে আমি লক্ষ্য করতাম। কেমন মজা লাগতো। নিজেকে অন্য মেয়ের থেকে আলাদা ভাবতে আরম্ভ করলাম। ক্লাশের বন্ধুরা তাদের দাদাদের চিঠি এনে দিতো আমার কাছে। একটারও উত্তর দিইনি। ঐ বয়সেই কেমন করে বুঝে নিয়েছিলাম আমি খুব দামী।

পড়াশুনায় ভালো ছিলাম চিরকালই। কলেজে উঠে স্বাধীনতা মিললো একা যাওয়া আসার। আর এমনি সময় বিভূতি গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপ। আমাদের সঙ্গে পড়ত একটি মেয়ে, গোলপার্কে থাকে, তাকে লিফট দিতে এসেছিল কলেজের দরজায়। সম্পর্কে ওর আত্মীয় হয়। বন্ধু আমাকে সঙ্গী করলো, একই দিকে থাকে বলে উঠে বসলাম গাড়িতে। আলাপ হলো। পাইলট অফিসার। চার অঙ্কের মোটা মাইনের মানুষ। অথচ বয়স ত্রিশের নিচেই। দ্বিতীয়বার ডুবলাম।

যেদিন ওর ডিউটি থাকতো না সেদিন রাসবিহারীর মোড় থেকে গাড়িতে উঠতাম আমি। ব্যবস্থাটা ইচ্ছে করেই করেছিলাম। গড়িয়াহাটার মোড় অবধি পরিচিত ছেলেদের আনাগোনা বেশী। খবরটা রাষ্ট্র হতে সময় লাগবে না। তার ওপর আর এক উৎপাত শুরু হলো। পাড়ার একটা ছেলে সঙ্গ নিতো রোজ। আমি হাঁটতে হাঁটতে মোড় অবধি এসে বাসে উঠতাম। সেও আসতো ঐ পর্যন্ত কথা বলতে বলতে। প্রথম প্রথম ভেবেছি তাড়িয়ে দেবো, দাদাকে বলবো বিরক্ত করছে। কিন্তু ভেবে দেখলাম এ এক রকম ভালোই হলো, ও সঙ্গে থাকলে আর কেউ বিরক্ত করতে পারবে না। কোলকাতার রাস্তায় আমার মত সুন্দরী মেয়েদের বিপদ অনেক যে। সেই ছেলেটার জন্যে যে আমার মায়া হতো। ও আমাকে রোজ বলতো সিনেমা দেখার কথা রেস্টুরেন্টে ঢোকার কথা। আমি হেসে এড়িয়ে যেতাম। তা ধৈর্য্য ছিল বটে ওর, অনেকদিন আমার প্রহরার কাজ করে গেছে।

প্রত্যেক মেয়ের একটা এমন বয়স থাকে যখন সে খুব চাকচিক্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে যে জীবন আমি কাটিয়েছি তাকে আর-যা ইচ্ছা বলি বৈচিত্র্যপূর্ণ বলতে পারবো না। সেদিক দিয়ে বিভূতির পাশে বসে ওর গাড়িতে কোলকাতা ছাড়িয়ে অনেক দূর দূর যাওয়ার মধ্যে অদ্ভুত একটা আনন্দ পেতাম। গড়িয়াহাটায় বাসে চেপে রাসবিহারীর মোড়ে নেমে পড়তাম। কোনদিনই দাঁড়িয়ে থাকতে হতো না। সময়ের ব্যাপারে ও ছিলো খুব ঠিকঠাক। গাড়িতে উঠে খাতাপত্র ছুঁড়ে দিতাম পেছনের সিটে। তারপর কখনো ডায়মণ্ড হারবারের রাস্তায়, কখনো বি টি রোড কখনো হাওড়া ছাড়িয়ে খড়্গপুরের দিকে। এক হাতে গাড়ি চালাতো বিভূতি আর অন্য হাতে আমার কোমর চেপে রাখতো। গান গাইতে ইচ্ছে হতো, কিন্তু মুস্কিল হলো রবীন্দ্রসঙ্গীত ও একদম পছন্দ করতো না। ফলে মুস্কিলে পড়ে যেতাম আমি, কাঁহাতক চুপ করে থাকা যায়। মনে মনে গান গেয়ে যেতাম।

আমাদের একটা মজার খেলা ছিল। অনেকদূরে কোন ফাঁকা মাঠ বা ধানক্ষেতের পাশে গাড়ি দাঁড় করাতো বিভূতি। তারপর কাঁচ তুলে দিয়ে ও আমাকে আদর করতো। দু পাশের ধূ-ধূ মাঠ বা ধানের গাছ, আমরা কি নির্জনে আদব করে যাচ্ছি নিজেদের। চুমু খাওয়ার সময় অতবড় মানুষের মুখ কি বাচ্চা দেখায় (রাগ করোনা, তোমাকে ঠিক সেরকম দেখাতো)। রাস্তায় যেসব গাড়ি চলাচল করতো তারা দৃশ্যটা যেটুকু দেখতে পেতো হর্ণ বাজিয়ে আমাদের জানান দিয়ে যেত। কেয়াব করতো না বিভূতি। একদিন দেখি দুটো অবাক হওয়া চোখ গাড়ির কাঁচে সেঁটে আছে। যেন এতে বিস্ময় ও কোনদিন বোধ করেনি। সরে এসে দেখি একটা বছব সাতেকের বাচ্চা, প্রায় উদোম চেহারা, হাড়-জিরজিরে বুক নিয়ে হাঁপাচ্ছে। দুপাশের ফাঁকা মাঠে ও কেন এসেছিলো কে জানে। খুব লজ্জা লেগেছিলো। এখানে একটা কথা বলে নিই, যেহেতু আমি মানুষ, বিভূতির শারীবিক সংস্পার্শ এসে অনেক সময় নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। আদর কবতে জানতো ও, আর সেই সময় নিজের যা কিছু একটা মেয়েব দেবার থাকতে পাবে আমি অনায়াসে ওকে দিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ও তা নেয়নি। বলেছে, 'এটা থাক। বিয়ের পর তোমার একটা জিনিস একদম নতুন পেতে চাই।' আমার বিশ্বাস, বিভূতি এসব ব্যাপারে অনেক আগেই অভিজ্ঞ ছিলো। মেয়েদের সবরকম গোপনতা ও আবিষ্কার করে ফেলেছিলো নিশ্চয়ই। ওভাবে আদর কোন মানুষ অভিজ্ঞতা না থাকলে করতে পারে না। যেমন তোমাকে আনাড়ি দেখে,ছ। তা সেইজন্যে হয়তো আমার সবটুকু ও নিয়ে নিতে চায়নি তখনই।

তারপর একদিন ঘটে গেলো ব্যাপারটা। একদিন ওর আসার কথা ছিলো না, কিন্তু সকাল থেকেই আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো বেড়িয়ে পড়ি। কলেজ যাবার নাম করে সময়টা কোথাও কাটিয়ে আসি। দুবার ফোন করলাম ওর অফিসে। ওদের অফিসটা ছিল মিশন রোডে। একদিন দেখেছিলাম। দুবার ফোন করে ওকে পেলাম না,

আজ ওর ফ্লাইং নেই তবে খুব ব্যস্ত। কিছুতেই শুনলাম না, জোর করতে লাগলাম খুব। অনেক আপত্তির পর শেষ পর্যন্ত ও রাজী হলো। বুঝলাম, গলার স্বরে টের পেলাম ওর অস্বস্তি হচ্ছে।

ঠিক দুপুরবেলায় কলেজের সামনে এলো গাড়ি নিয়ে। উঠে বসে বললাম ব্যাণ্ডেলে যাবো। ও কোন কথা বললো না। গাড়ি চালাতে লাগলো চুপচাপ। এমনকি ফাঁকা জায়গায় এসে আমাকে একবারও আদর করলো না। অথচ এটুকুর জন্যে ও রোজ ছটফট করতো, কখন ফাঁকা জায়গা আসবে ! রাগ হয়ে গেলো, ওকে গাড়ি থামাতে বললাম। চট করে ব্রেক কষে ও আমার দিকে তাকাতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আর তখনি আমি টের পেলাম। ওর মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে। বিশ্রী গা গুলোনো গন্ধ। ছিটকে সরে এলাম। ও একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'এই জন্যেই আজ আসতে চাইছিলাম না।' এতক্ষণে রাগে আমার শরীর রি রি করছে। গাড়ি ঘোরাতে বলতেই ও রাজী হলো। ভেবেছিলো আমি ঠাণ্ডা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেকবার প্রবোধ দেবার, ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করলো। রাসবিহারীর মোড়ে আমায় নামিয়ে দিয়ে পরদিন আসবে বলে চলে গেলো। কিন্তু আমি আর যাইনি। সেই রাগ সেই গা ঘিন ঘিন ভাবটা কিছুতেই গেলো না আমার। আমি যার সঙ্গে মিশবো আমি ছাড়া অন্য কিছু নেশা তার থাকবে ভাবতে গেলেই গা জ্বলে যাচ্ছিলো। মাতাল মানে তো আমার কাছে একটাই—ভালবাসা যার নাম। অন্য কিছু আমি সহ্য করতে পারি না যে।

আর আমি ওর সঙ্গে দেখা করিনি। বারবার এসেছে কলেজে, ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি কি অন্যায় করেছি ? শুনেছি, বন্ধু বলতো ও নাকি আরো মদ খাচ্ছে। শুনে ঘেন্নাটা বেড়ে যেতো। মাঝে মাঝে ভাবি এর কোন যুক্তি নেই, একটা পুরুষ মানুষ একদিন মদ খেলো কি না খেলো তা দিয়ে ভালবাসার বিচার হয় না। এই

আমিই তো ছেলেবেলায় দেবদাস পড়ে কেঁদেছিলাম। তাহলে? কি বলবো একে, এই অহঙ্কারকে? বলো? আমি খারাপ, খুব খারাপ, তাই এরকম করতে পারলাম, এ ছাড়া আর কি বলতে পারি নিজেকে।

এরপর অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে নিয়েছিলাম নিজেকে। কেমন করে বুঝে নিয়েছিলাম, আমি কাউকে ভালোবেসে পেতে পারি না। বই-এ পড়তাম একটা মেয়ে জীবনে একবাবই ভালবাসে, ভালোবেসে মরে, মরে শহীদ হয়ে যায়। দ্বিচারিণী বা বহুকল্পনা শব্দগুলো তো এই সংজ্ঞাকে যে মানে না তাদের জন্যই রাখা হয়েছে। তাই না? রমেনদার পর বিভূতি, আমি অনেক ভেবেছি, একটি মেয়ে সত্যিকারের ভালবাসা কবার বাসতে পাবে। স্বীকার করছি, বমেনদার ব্যাপারে আমি ছেলেমানুষ ছিলাম। তবু এখনো রমেনদার সেই জ্বরো মুখটা মনে করলেই বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। কেন? তাহলে আমি বিভূতিকে কি কলে ভালবাসলাম? না হলে ও যখন গাড়ির বন্ধ বাতাসে আমাকে আদর করতো আমি কেন বার বার সরে সবে যেতাম? কি সুখে? বেশ, বিভূতিকেই আমি আসল ভালবাসা যাকে বলে তাই বেসেছিলাম যদি বলি, দুঃখ পাইনি কেন ছাড়াছাড়ি হবাব পর। কেন পাগল হয়ে যাইনি! আমি কি দ্বিচারিণী? জানো, সুমি, আমার বিশ্বাস। আমি নিজেকেই ভালবাসতে পারিনি কখনো, আর নিজেকে ভাল না বাসলে অন্যকে ভালবাসা যায় না! তাই না?

এখানেই সব কিছু থেমে থাকতে পারতো। বরেন মুখার্জীর মত একজন অফিসার (যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি) আমার জীবনে এসে আমাকে গোটা তিনেক সন্তানের মা করে দিতে পারতো নিঃসন্দেহে। শরীর, আমার শরীর। এর সব চাহিদা আমি বুঝি না। পুরুষ বন্ধু ছাড়া কলেজের দিনগুলো তো বেশ কেটে যাচ্ছিলো। হঠাৎ একদিন নতুন অধ্যাপক এলেন। আমাদের পড়াতে। রোগাটে চেহারা, ফরসা, চোখে চশমা। আমার তেমন কিছুই মনে হয়নি। উনি গল্প

লেখেন। তরুণ লেখক। 'দেশে' ওর গল্প দেখলাম একদিন। আর এই প্রথম চাক্ষুস একজন লেখককে দেখলাম। গল্পটার চরিত্রগুলো কেমন বানানো বানানো। ইচ্ছে হচ্ছিলো গিয়ে প্রশ্ন করি। তারপরই কৌতূহল বা উৎসাহ ফুরিয়ে যেত আচমকা। ভালো লাগতো না কিছু। দেহবাদ সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে একদিন হঠাৎ অধ্যাপক মশাই আধুনিক কবিতায় চলে এলেন। আজকালকার কবি এবং লেখকদের কথা অন্য অধ্যাপকরা সযত্নে এড়িয়ে যেতেন। যেন উনিশশো চল্লিশের পর আর কিছু লেখা হয়নি। কিন্তু সেদিন উনি যখন আবৃত্তি করলেন, 'আ-আলজিভ চুম্বন করো, শব্দ উঠুক, কাঁপুক ব্রহ্মাণ্ড।' তখন, কি হলো জানি না, আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো। ক্লাশের অন্য মেয়েরা লজ্জা পাচ্ছে দেখলাম, আমি কিন্তু ভীষণভাবে শব্দগুলোয় ডুব দিয়ে স্নান করলাম। আর সেটা অধ্যাপক লক্ষ্য করলেন। আমি জানতাম উনি যে কোন লাইন বলতে শুরু করে শেষ করতেন আমার দিকে তাকিয়ে। এদিন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তৃপ্ত হলেন হয়তো। আর আমার কাছে ওর চেহারাটা একদম অন্যরকমের হয়ে গেলো। আমি আবার বোকামি করে ফেললাম।

আলাপ হবার পর জানতে পারলাম উনি আমাদের পাড়ার কাছাকাছি থাকেন।' ব্যাচেলার লোক। একটা দু-ঘরের ফ্ল্যাটে, একদম একা। আমরা তিন-চারজন মেয়ে একদিন দল বেঁধে হানা দিলাম ওখানে, পড়া বুঝতে। খুব সুন্দর বোঝাতেন উনি। এমনি যখন কথা বলতেন ভারী ভালো লাগতো। কথা বলা যে একটা আর্ট ওর কথা শুনে বুঝলাম আমি। তারপর একা একা যাওয়া শুরু করলাম। প্রথম প্রথম চেয়ারে বসে গল্প আর গল্প। রবীন্দ্রনাথের যে এতো ভালবাসার জন ছিলো তা আমি জানতাম না। আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ যে মন নিয়ে নতুন বৌঠানকে ভালোবাসতেন তা নিয়ে কি মৃণালিনী দেবীকে ভালবাসতেন? মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে যখন উনি দাম্পত্য জীবন পালন করতেন তখন কি নতুন বৌঠানকে একবারও

ভাবতেন? তারপর ওঁর বিজয়া? কিংবা আন্না অথবা নলিনী? এতো মানুষকে উনি ভালবাসলেন আর তার মধ্যে তো কোন খাদ ছিলো না! যখন যার কাছে গেছেন তাকে তো পুরো মনটাই দিয়েছেন। মন কি এঁটো হয়? নাকি, উনি বড়, এতো বড় যে ওঁর তৃপ্তি ছিলো না কিছুতেই। নাকি দুঃখ ওকে অতৃপ্ত করেছিলো? আমি তো সাধারণ মেয়ে (তবে সেই কবিতার মতো নয়), তবে আমি কেন এতো সহজে বারবার ভালোবেসে ফেলি এমন করে।

কিন্তু কবিতায় যা সম্ভব বাস্তবে তো তা হয় না। অধ্যাপক আমাকে যখন চুম্বন করতেন তখন আমার শরীরে পুলক জাগতো না কেন? শব্দ হতো কিন্তু কেন ব্রহ্মাণ্ড কাঁপতো না? কেন ওকে অক্ষম দুর্বল মনে হতো? ক্রমশ গা ঘিন ঘিন ভাবটা ফিরে এলো মনে। অনেকবার ভেবেছি এ আমারই অক্ষমতা। নিতে না পারার দীনতা। তারপর যেদিন উনি আমার সবটুকু চাইলেন, আমি পালালাম। কেন? আমি তো ওকে বিয়ে করে সংসারজীবন যাপন করতে পারতাম এতোদিন! না, আফসোস হয় না একদম, মনে মনে জানি ঠিকই করেছি।

এই সব কবে টরে চলে যাচ্ছিল আর কি।

য়ুনিভার্সিটিতে এলাম। আর এসেই তোমাকে দেখলাম। এবার কেউ এসে আমাকে বলেনি ভালোবাসি। শুধু চোখের দেখা বুকের মধ্যে এমন করে কি ভাবে ঝড় তোলে। কেন বাড়িতে এসে শুতে বসতে পারি না? মনে মনে অনেক ভেবেছি আমি। আমার কাছে পুরুষ মানুষ নতুন নয়। যদিও আলাদা হয় কিন্তু তার পরিণতি তো একই। একটি মেয়ের হাত, মুখ থেকে যার যাত্রা শুরু, বুক হয়ে উরুসন্ধিতে না পৌছানো পর্যন্ত তার ক্ষান্তি নেই। তবে কেন বার বার সেখানেই ফিরে যাবো? তবু কেমন জেদের বসে তোমার সঙ্গে নির্লজ্জর মত আলাপ করলাম। করেই বুঝলাম তুমি এইজন্যেই যেন জেগে আছো। আর তোমার জীবনে মেয়ে আসেনি আমার আগে। বাড়ি ফিরে এসে খুব কষ্ট হলো, ভাবলাম না, আর নয়। তোমার

জীবন অশান্ত করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না। কিন্তু মনে মনে যে এতো লোভ আমার, ভালবাসতে আর ভালবাসা পেতে, আমি পারলাম না। নিজের কাছেই হেরে গেলাম।

ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াতে গিয়ে তোমার বন্ধুরা যা করেছিলো আমরাও তো তা করতে পারতাম। তাহলে আজ আমাকে এমন করে জবাবদিহি দিতে হতো না। বিবেকের কাছ থেকে নিস্তার পেতাম। কিন্তু সেদিন বুঝলাম ভালবাসা কারে কয়।

সোনা, অন্ধকারের যে এতো ডালপালা আছে আমি তা জানতাম না। তুমি বলতে, আমি গম্ভীর কেন এতো! আমার মনে হতো এই একুশ বছরেই আমি খরচ করে ফেলেছি নিজেকে। নিজের বলতে আর এক তিলও বাকী নেই আমার। তোমাকে আমি কি দেবো বলো?

বয়েসে তোমার সমান হবো আমি, কিন্তু তোমার চেয়ে অভিজ্ঞতায় আমি বয়স্ক। আমাকে এমন করে লোভ দেখিও না তুমি। তোমার সামনে গোটা জীবনটাই পড়ে আছে। জানি একদিন তুমি অনেক বড় হবে। এখনি নিজেকে নষ্ট করবে কেন?

বাবা-মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজেকে বুঝি না বলেই এই প্রতিজ্ঞা করেছি আমি। আমার ভয় ছিলো, যদি তোমার সঙ্গে আগের আগের মত আমার বিচ্ছেদ হয়ে যায়—সে আমি সইতে পারবো না তো।

তার চেয়ে এই ভালো। আমিই এগিয়েছিলাম আমিই সরে যাচ্ছি। সব দোষটুকু আমার সঙ্গে থাকলো।

তুমি এ নিয়ে একদম ভাববে না। (কি বোকার মত বলছি)। সুমিত, আমার সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগের আঙুল উঁচিয়ো না, প্লিজ। অসাধারণ নাই বা হলে, সাধারণের দলে ভীড় করো না, দোহাই।

একটা লোভ মনের মধ্যে মাথা কুটছে। জানতে ইচ্ছে হয়, কতদিন তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করতে পার, কতদিন? আচ্ছা

ধর, পাঁচ বছর পরে যদি আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াই তুমি আমায় নিতে পারবে? অপেক্ষা করতে পারবে? ততদিন এই পৃথিবীতে যাই হোক না কেন?

কি জানি কি হয় আমার!

আমি জানি তুমি আমার থাকবে। আমি আমার অন্ধকার ধুয়ে মুছে আসি, লক্ষীটি। আমাকে সুযোগ দাও।

ভালো থেকো বলতে এতো কান্না পাচ্ছে কেন গো?

তবু, ভালো থেকো। এই, আমি রেণু।'

ভালো আছি, আমি খুব ভালো আছি। হাসতে গিয়ে থমকে গেলো সুমিত। ব্যবহারে সব কিছুর ধার কমে যায়। প্রথমদিন এই চিঠি পড়ে বুকের মধ্যে পাক খেয়ে যায়!

কাল রেণু আবার ফিরে গেলো বরেনের কাছে। কেন?

এ চিঠি কেন রেখে দিয়েছিলাম আমি? একটা বাড়ি সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যাবার পর তার প্লানটা রেখে দিয়ে কি লাভ হয়! বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফস করে দেশলাই-এর কাঠি জ্বালালো সুমিত। কাগজের একটা কোণ ধরে ফেললো ছোট্ট আগুনটা। তারপর অক্ষরগুলো দুমড়ে মুচড়ে কেমন কালো কালো হয়ে যেতে লাগলো। মেঝেতে ফেলে দিলো ও পুড়তে থাকা চিঠিটা। তারপর কি মনে হতে ছবিটাকেও আগুনের ওপর উপুড় করে রাখলো। গন্ধ বেরুচ্ছে এখন। চোখ পড়লো ওর, জলের মতো বিড়বিড় করে কি উঠছে ছবিটা থেকে? রেণুর মুখ আগুনে উপুড় করে রাখা। চোখ বন্ধ করে শুতে গিয়েই ও কান খাড়া করলো। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। শব্দটা এসে থামলো ওর দরজায়। আর সঙ্গে সঙ্গে কড়া নড়ে উঠলো। কে?

উঠে দাঁড়ালো ও খাট থেকে। ধোঁয়া উঠছে পুড়ে যাওয়া চিঠি আর ছবি থেকে। পা দিয়ে ছাইগুলো মাড়িয়ে দিতে লাগলো ও। না আগুন নেই। হঠাৎ নজরে পড়লো ছবিটার একটা কোণ পুরোটা পোড়েনি। হেঁট হয়ে ওটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলো, ধোঁয়াটে

কাগজে তিনটে কালো কালো অক্ষর অর্ধেক পোড়া। খুব অস্পষ্ট কিন্তু আন্দাজে পড়ে নেওয়া যায়—এই আমি রেণু।

হঠাৎ সুমিতের মনে হলো যেন এইমাত্র একটি শব দাহ হয়ে গেলো, আর ও তার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চিতার আগুন নিভে গেলে জল ঢেলে দেওয়া হয়ে গেলে যে অদ্ভুত শূন্যতা চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে—সুমিত যেন তা টের পাচ্ছিলো।

দরজায় আবার শব্দ হলো। ভারী পা টেনে টেনে সুমিত দরজায় দিকে এগিয়ে গেল। এখন ওর খেয়াল নেই যে ওর হাতের মুঠোয় সেই আধপোড়া ছবির টুকরোটা ছাইমাখামাখি হয়ে রয়েছে।

চার

খানিক বাদে বরেন বুঝতে পারলো আজ রাত্রে ওর ঘুম আসবে না। এমনিতেই আজকাল ভালো ঘুম হয় না, কিন্তু আজ অসম্ভব।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ও কিছুক্ষণ পায়চারি করলো। এখন এ বাড়ি চুপচাপ, এমন কি পাড়াটাও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পরিষ্কার একটা দাঁড়ি টেনে দেওয়া গেলো সম্পর্কের—বরেন ব্যাপারটা ভাবলো। এতো রাত্রে রেণু ফিরে এলো, একা, কি ব্যাপার ? আর আজ প্রথম ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলো, আত্মসমর্পণ করতে চাইলো। কেন ? এই ব্যাপারটা যদি ফুলশয্যার রাত্রে করতো ও, তাহলে এতদিন ধবে বরেনকে এভাবে জ্বলতে হতো না, সামনে পড়ে থাকা জীবনটায় অন্ধের মতো হাতড়াতে হতো না। হঠাৎ ওর মনে হল, মেয়েটা বোকা। বোকা না হলে এরকম পরিকল্পনাহীন কাজকর্ম করে ! জামসেদপুরে প্রথম যেদিন ওকে দেখছিলো সেদিন যেভাবে রেণু হেঁটে এসেছিল, যেভাবে অন্যমনস্ক হয়ে পার্কের ফোয়ারাগুলো দেখছিলো, বরেন হঠাৎ সেই রেণুকে ভেবে ফেললো।

আশ্চর্য রকমের একটা হার হয়ে গেল ওর। আজ অবধি জীবনের কোন পরীক্ষাতে হারেনি ও, কর্মজগতে বাধা পায়নি কখনো কিন্তু একটা সামান্য ছেলের কাছে হেরে যেতে হচ্ছে ওকে। যে ছেলের কোন চালচুলো নেই, মেরুদণ্ড নেই। মেরুদণ্ড থাকলে ও এমন করে রেণুর বিয়েটা হতে দিতো না। নাকি এখনও প্রতীক্ষা করে আছে, কবে রেণু ফিরে আসবে ? না তা নিশ্চয়ই নয়—তাহলে রেণু আজ এভাবে আত্মসমর্পণ করতে আসতো না।

সিগারেটের শেষ হয়ে আসা টুকরোটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বরেন। বাতাসে অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে গেলো সেটাকে, তারপর রাস্তায় পড়ে গড়িয়ে যেতে লাগলো। এত দূর থেকেও

বরেন টুকরোটার মুখে আগুনের ফুলকি উড়তে দেখলো। আগুনটা নিভিয়ে ফেললে হতো। কিন্তু না, এখন আর ফুলকি উড়ছে না, যে কোন আগুন একসময় নিভে যায়।

আজ রেণুর চলে যাওয়া মানে চিরকালের জন্য যাওয়া। সারাটা জীবন এখন একা একা কাটাতে হবে। যদি বিচ্ছেদ আইন মেনে নেয়, যদি রেণু কোন ক্ষতিপূরণ দাবী নাও করে তাহলে আবার কাউকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার কথা কল্পনা করতে ইচ্ছে হয় না। অন্তত এই বয়সে। এইভাবে হেরে যেতে ওর ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু কি করতে পারে এখন, কি করা যায়।

খুট করে কোথাও একটা শব্দ হলো। কেউ যেন দরজার ছিটকিনি খুললো। এই নিস্তব্ধ রাত্রে শব্দটা বেশ জোরেই ওর কানে এলো। কিন্তু বোঝা যায় যেই দরজা খুলুক সে চেয়েছিলো খুব সন্তর্পণে করতে। সতর্কতার একটা ছাপ রয়েছে শব্দের মধ্যে। এতো রাত্রিতে আর কে জেগে আছে? রেণু এসেছে মা বা নীরেন নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু ওরা কেউ একবারও সামনে আসেনি। নীরেনের সঙ্গে ও নিজেকে মেলাতে পারছে না আর। মায়ের ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারেনি ও আজো। মা যেন কেমন একটা দূরত্ব রেখে গেছেন চিরটা কাল। ওর মনে মনে ভয় হয়, শেষ বয়সে এসে বাবা মাকে এমন করে আর একটা সন্তান দিলেন তা বোধহয় মা ক্ষমা করতে পারেননি কোনকালে। মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক কেমন ছাড়াছাড়া ছিলো। বরেনও মাকে কোনদিন ঠিক কাছের করে পায়নি। বিয়ে করে যাকে ঘরে নিয়ে এলো, সে তো অনেক দূরের মানুষ।

চাপা পায়ের আওয়াজ কানে এলো। কেউ যেন খুব সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছে। শব্দ না করে বাইরের বারান্দায় এলো বরেন। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। প্রায় শেষ রাত্রের কোলকাতাকে কেমন ঘুমে কাদা বাচ্চা ছেলের মত দেখাচ্ছে। রেণুর ঘরের এদিকের দরজা খোলাই ছিলো, এখনো বন্ধ করেনি। তবে আলো নেভানো। দরজায়

দাঁড়িয়ে দেখলো বাইরের আবছা আলোয় ঘরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। আলো জ্বালালো বরেন। না, ঘরে কেউ নেই।

অবাক হয়ে চারপাশে তাকালো বরেন। রেণু কোথায় গেলো? এতো রাত্রে? একটু আগে শোনা শব্দ এবং চাপা পায়ের আওয়াজ ওর মনে পড়লো। তাহলে রেণুই কি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। এই সময়ে ও কোথায় যাবে? প্রশ্নটা মনে হতেই ওর পায়ের তলা কেমন শিরশির করে উঠলো। রেণু যদি পরিচিত কারো কাছে যেতো তাহলে নিশ্চয়ই ভোর অবধি অপেক্ষা করতো। তাহলে? রেণু কি আত্মহত্যা করতে চাইছে?

ব্যাপারটা ভাবতেই ওর মাথার মধ্যে একসঙ্গে কতগুলো চিন্তা হুড়মুড় করে এসে গেলো। রেণু যদি আত্মহত্যা করে তাহলে কি হবে? ওর চাকরী, ওর সম্মান? আঃ। এরকম বোকামি ও কি করবে? হঠাৎ সেই বইটার কথা মনে পড়ে গেলো ওর। গ্রাণ্ড হোটেলের তলা থেকে কেনা—পয়েজড্ ফর দ্য কিল্। রেণু যদি মারা যায় কেউ বিশ্বাস করবে কি? যদি ওর বিরুদ্ধে কেউ খুনের অভিযোগ আনে? আনতে পারে, খুব সহজেই পারে। ওদের সম্পর্কের কথা কারোর তো অজানা নেই। রেণুর বাড়ির লোক কি ছেড়ে দেবে? তাছাড়া এ পাড়ার লোকজন বলবে ওরা কি ভাবে দিন কাটাতো! বরেনের মনে হলো সেই বইটার ছবির মতো, কেউ যেন ওর দিকে ওৎ পেতে বসে আছে, এখন যে কোন মুহূর্তেই লাফিয়ে পড়তে পারে।

কাল সকালে আমি একটা বেশ্যার মুখ দেখতে চাই না—এইভাবে কথাগুলো না বললেই হতো। অথচ তখন এমন উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো ও, এতোটা ভাবেনি। ব্যাপারটা তো অন্যভাবে ট্যাক্ল করা যেতো। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলো বরেন। রেণুর ঘরের মধ্যে কোন চিহ্ন নেই। এ ঘরে কেউ ছিলো, এখন এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি বসার ঘরের দরজায় এসে

দাঁড়ালো বরেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো। বাইরের দরজাটা হাওয়ায় নড়ছে, সামান্য খোলা।

দ্রুত পায়ে বাইরে এলো ও। দরজা খুলে দাঁড়াতেই নজর পড়লো এপাশের বালকনিতে যেখান থেকে সিঁড়িটা নেমে গেছে নিচে, রেণু দাঁড়িয়ে আছে। আচমকা ওকে পাথরের মূর্তির মত মনে হলো বরেনের। লোহার রেলিংএ দুহাতের ভর দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। এমনভাবে ঝুঁকে আছে ও যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে।

প্রায় পা টিপে টিপে বরেন রেণুর পেছনে এসে দাঁড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো রেণু, চমকে ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখতে পেয়ে যেন আঁতকে উঠলো, তারপর একটা হাতে মুখ চেপে বলে উঠলো, 'না-না-না!' ওর চোখ বড় হয়ে উঠেছিলো, মৃগী রোগীর মত গোঙাতে লাগলো ও। বরেন অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলো হঠাৎ দেখলো, রেণু পড়ে যাচ্ছে।

ওকে ধরে ফেলবার আগেই রেণু মেঝেতে পড়ে গেছে। চাপা গোঙানি বেরুচ্ছিলো মুখ থেকে প্রথমটা তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলো। কুলকুল করে ঘামতে লাগলো বরেন। দুপাশে একবার তাকিয়ে দেখলো, না, কেউ জেগে নেই। তারপর চট করে রেণুকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো ও।

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর মনে হলো রেণুর শরীর থেকে অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ এসে ওর শরীরে মাখামাখি হয়ে গেছে। দুটো হাতে, বুকে, যেখানে রেণুর শরীরের ভার ছিলো সেখানে অন্য কিছু বোধ করলো ও। চট করে বাইরের দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো বরেন। রেণু তেমনি শুয়ে আছে। মুখটা ওপর করা, লম্বা গলার নীল শিরাগুলো দপ দপ করছে। মুখটা ঈষৎ হাঁ করা তাই দাঁতের সাদাটে অংশ চিক চিক করছে আলোয়।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে এক হাতে কপালের ঘাম মুছলো বরেন। ওকে দেখে রেণু ওরকম করে উঠলো কেন? ভয় পেয়েছিলো এটা

ওর ভঙ্গীতে বোঝা গেছে 'স্পষ্ট। কেন? ও কি ভেবেছিল বরেন ওকে খুন করবে? রেণু কি নার্ভাস অথবা ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল, নাকি কিছু খেয়েছে? রেণুর বুকের ওপর হাত রাখলো বরেন। হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক শব্দ করছে। সব মানুষের হৃৎপিণ্ডই এক শব্দ করে তবে সবার সুখ দুঃখ সমান হয় না কেন? চোরের মত হাতটা সরিয়ে নিলো ও। এখন কি ডাক্তার ডাকা উচিত নয়! যদি জ্ঞান না ফেরে! ও অসহায়ের মত রেণুর মুখের দিকে তাকালো। স্মেলিং সল্ট নেই বাড়িতে। বরং জল ছিটিয়ে দিলে কাজ হবে। ঘর থেকে বেরতে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের টেবিলের ওপর বইটা খোলা। 'পয়েজড ফর দ্য কিল'। শিরশির করে উঠল ওর শরীর। এ বই কোথা থেকে এল এখানে? কে আনল? দ্রুত এসে বইটা তুলে নিলো ও। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো ঘরের কোণায়। বইটা কি রেণু পড়েছে? তাই কি ও এমন শিউরে উঠেছিল বরেনকে আচমকা পাশে দেখতে পেয়ে! রেণুর সেই চোখ, হাত চাপা দেওয়া মুখের গোঙানি—বরেন দুহাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়লো। ওর এতো দিনের সংযম, বয়েস বয়ে আনা অভিজ্ঞতা সব যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো আচমকা। দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত কেঁদে উঠলো বরেন।

হঠাৎ ওর খেয়াল হলো কেউ ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর তার পরেই ও মাথায় হাতের স্পর্শ পেলো।

রেণু ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ পাথরের মত উদাস, বরেনকে তাকাতে দেখে হাত সরিয়ে নিলো। কখন ওর জ্ঞান ফিরেছে কখন ও খাট থেকে উঠে ওকে দেখেছে, দেখে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একদম টের পায়নি বরেন।

রেণুর চোখের দিকে তাকালো বরেন। এখন ওর নিজের দৃষ্টি কেমন আবছা, বড় ভারী লাগছে চোখের পাতা। চোখ সরালো না রেণু। কোন রকম রেখা ফুটলো না ওর মুখে। বরেন শুনলো রেণু বলছে, 'এখন আমি কি করবো?'

আর এই সময় বরেনের মনে হলো ওর মত রেণু ভীষণ একা।

কি নিঃসঙ্গ হয়ে ওরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে অথচ যার পরিণতি কারো কাছে সুখের হবে না। না, আর ও হারতে পারে না। জেতার সুযোগ জীবনে বার বার আসে না।

বরেন উঠে দাঁড়ালো, 'তুমি কথা বলো না, তোমার শরীর ঠিক নেই।'

হাসতে চাইলো রেণু, 'আমি ভয় পেয়েছিলাম। এতো ভয় নিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। আমি মুখ দেখাতে চাইনি।'

বরেন কোন কথা বললো না। চোখ সরিয়ে নিলো রেণু, 'এখন কি করবো।' নিজের মনে যেন কথাটা বললো ও।

'তুমি আমার কাছে থাকবে!' এছাড়া মুক্তি নেই, বরেন বলে ফেললো।

দুটো ঠোঁট চেপে থর থর করে কেঁপে উঠলো রেণু, তারপর ধরা গলায় বললো, 'আমার যে একজনের কাছে দায় থেকে গেছে।'

দরজা খুলে সুমিত বলতে যাচ্ছিলো কাকে চাই? ওর সামনে যে ভদ্রলোক পাজামা পাঞ্জাবী পরে দাঁড়িয়ে আছেন তাকে ও চেনে না দ্যাখেওনি কোনদিন। এই কদিনে এতো নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে বাধ্য হচ্ছে ও, এখন বিরক্ত হলো। ও প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিল এমন সময় ভদ্রলোক দুটো হাত জোর করে নমস্কার করলেন। আরএই সময় ওর নজর পড়লো ভদ্রলোকের পেছনে একটু আড়ালে আব একজন দাঁড়িয়ে, যার পরণে হলুদ শাড়ি, চওড়া কপালে গোল করে সিঁদূরের টিপ পরা, সেই চিরকালের ভঙ্গীতে ঘাড় সামান্য বেঁকিয়ে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে একটু কেঁপে উঠলো সুমিত। বুকের মধ্যে সেই রবারের বলটা হঠাৎ ড্রপ খেতে আরম্ভ করলো।

সুমিত দেখলো ভদ্রলোক হাসলেন। লম্বা চেহারার চল্লিশে এসে পড়া বয়েসটা পাকাপাকি জানান দিলেও ভঙ্গীতে একটা সহজ তারুণ্য আছে যা চট করে বোঝা যায়। এই তাহলে রেণুর স্বামী!

নমস্কার করে বরেন বললো, 'আমার নাম বরেন মুখার্জী। আর একে তো চেনেন।'

কি বলবে বুঝতে পারছিলো না সুমিত। রেণু ওর স্বামীকে কেন নিয়ে এসেছে? চিঠির জন্য কি? না আরো কোন অপমান ওর জন্যে অপেক্ষা করছে! রেণুর দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করলো ও। বরেন পরিচয় দিয়ে মুখ ফিরিয়েছিলো। দেখলো, রেণু কেমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি কি এসে কোন অসুবিধে করলাম!' দুটো হাত সামান্য তুলে অপরাধীর মত ভঙ্গী করলো বরেন। 'আমি' শব্দটা লক্ষ্য করলো সুমিত। দুজনে এসেছে অথচ ও আমরা বললো না। সুমিত ঘাড় নেড়ে বললো, 'বলুন কি করতে পারি!'

'করতে তো পারেন মশাই অনেক কিছু!' তবু জোরে জোরে বললো বরেন, 'কিন্তু তার আগে আমাদের ঘরে ঢুকতে দেবেন তো!'

এক নজর ওদের দেখে নিয়ে সুমিত বললো, 'আসুন।'

প্রায় ওর পেছন পেছন বরেন ঢুকে পড়লো ঘরে। সুমিতের একটু অস্বস্তি হচ্ছিলো, এমনিতে গোছালো নয়, তাছাড়া দুদিন ধরে ঘরের দিকে একদম নজর দেয়নি ও। জিনিষপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বেডকভারটা পাল্টানো উচিত ছিলো। রেণু ঘরে এলো। এসে দরজার পাশে টেবিলটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। ওর দুটো হাত সামনে, তাতে একটা ব্যাগ ধরা। বরেন এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

'খুব অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?' বরেন হাসছিলো।

'অবাক হবার মতো ব্যাপার নয়কি?' সুমিত বললো।

'না না, তেমন কিছু নয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চলে এলাম। আপনি আমার স্ত্রীর বন্ধু। তাই আলাপ করতে চাওয়াটা অন্যায় নয়, কি বলেন?' পকেট থেকে সিগারেট বের করে বরেন সুমিতের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলো, ঘাড় নেড়ে সুমিত না বলতে ও বেশ মেজাজ নিয়ে নিজেরটা ধরালো।

খানিকক্ষণ কেউ কথা বললো না। সুমিত টের পেলো আবহাওয়াটা কেমন অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। যদিও এই ভদ্রলোক, রেণুর স্বামী, খুব হাসিখুসী ভাব করছেন তবু কথাগুলো যেন অল্পেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। রেণু কোন কথা বলেনি ঘরে এসে অবধি। এখন একদৃষ্টিতে দেওয়ালে টাঙানো সুমিতের ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। রেণুর মুখের দিকে ও ভালো করে তাকাতে পারছিলো না, বরেন এখন ওকে দেখছে। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এগিয়ে গিয়ে বলে, কেন এসেছ রেণু? এভাবে তুমি আসবে আমি কল্পনাও করতে পারি না যে।

বরেন কেন এসেছে? ও কি কিছু একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়? রেণু এবং নিজের সম্পর্কটা সুমিতকে সামনে রেখে ভেঙ্গে দিতে চায়? মনে মনে তৈরী হয়ে গেলো সুমিত, তেমন হলে ও সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেবে। এই রেণু, সামনে যে মুখ তুলে ছবি দেখছে, বরেন সেরকম কিছু করতে চাইলে সানন্দে ওকে গ্রহণ করবে সুমিত। রেণুর কোন ভুল বা অন্যায় ওর মনের কোথাও ছায়া ফেলছিলো না, রেণুর মুখের দিকে তাকালে নিজেকে সম্রাট মনে হয় এখনও। ও ভাবলো রেণুকে বসতে বলবে, এখানে, এই খাটে।

'আপনার আজ অফিস নেই?' বরেন কথা বললো।

হাত দিয়ে মুখের ব্যাণ্ডেজগুলো দেখালো সুমিত, 'এভাবে অফিসে যাওয়া কি শোভন হতো?'

সোজা হয়ে বসলো বরেন, 'সত্যি, এভাবে আপনাকে জড়িয়ে পড়তে হলো বলে আমার খারাপ লাগছে। আমি ভাবতেই পারিনি আপনার ওপর শারীরিক টর্চার হবে। আমার বিশ্বাস, রেণুও জানতো না।'

সুমিত বললো, 'এখন এসব ভেবে কি হবে! আমার পেছনে তো আপনিও লোক লাগিয়েছিলেন। টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন আমাকে। আপনি কি মনে করেছিলেন টাকা দিয়ে আপনি সব কিছু করতে পারেন?

বরেন ওকে দেখলো, তারপর হেসে ফেললো, 'আপনার অভিযোগ সত্যি।'

'কি চান আপনি ?' সুমিত সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলো।

কথাটা একটু জোরে হয়ে গিয়েছিলো, রেণু মুখ তুলে ওকে দেখলো।

মাথা নাড়লো বরেন, 'না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। জানিনা কি চিঠি আপনার কাছে আছে—যাই থাক তার দাম নিশ্চয়ই আপনার কাছে অনেক। নইলে তো অল্প টাকায় সে চিঠি আপনি আমার লোককে দিয়ে দিতেন। তাই না ? আমি সেই চিঠি নিতে আপনার কাছে আসিনি।'

'তাহলে কেন এসেছেন ?' সুমিত বললো।

'সুমিতবাবু, ও চিঠির কোন দাম আমার কাছে এখন নেই। রেণু আপনাকে যা লিখেছে সে ওর নিজস্ব ব্যাপার—অংশীদার আপনি। আমি আর এ ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না!' বরেন হাসল, 'আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

কি শুনছে ও ? সুমিত ঠিক বুঝতে পারছিলো না। চিঠিটা হঠাৎ এতো মূল্যহীন হয়ে গেলো কি করে ? ও মেঝেতে পড়ে থাকা ছাইগুলোর দিকে তাকালো। টুকরো টুকরো হয়ে সেগুলো হাওয়ায় ঘরময় ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বরেনের দিকে তাকালো ও, 'বলুন ?'

'আপনি কি এখনো রেণুকে ভালবাসেন ?' খুব ধীরে শব্দগুলো উচ্চারণ করলো বরেন। করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো।

এরকম একটা প্রশ্ন বরেন করতে পারে ভাবতে পারেনি সুমিত। ও রেণুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিলো। রেণু কোনো কথা বলেছে না কেন ? রেণু কি বুঝতে পারছে না যে ওর কষ্ট হচ্ছে। এভাবে কিছুক্ষণ চললে ও বরেনকে মেরে বসতে পারে! খাটের ওপর সোজা হয়ে বসলো সুমিত, 'কি বলতে চাইছেন ?'

'বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি। রেণু

আমার কাছে বলেছে ওর নাকি আপনার কাছে কি দায় থেকে গেছে। দেখুন, আমি কোন মেয়েকে ভালোবাসার সুযোগ পাইনি। প্র্যাক্টিক্যালি আমি এই বয়েসের আবেগ ঠিক বুঝতেও পারি না।' আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি ওকে দায়মুক্ত করুন।' বরেন উঠে দাঁড়ালো।

'না আমার কাছে কারো কোনো দায় নেই। এ আপনি কি বলছেন? যেটা ছিল সেটাও একটু আগে নষ্ট করে ফেলেছি।' আঙুল দিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা ছাইগুলো দেখালো সুমিত, 'এখন আপনারা আমাকে একটু একলা থাকতে দিন।'

কেমন অস্বাভাবিক গলায় বরেন বললো, 'আপনাকে ছাড়া যে আমার, আমাদের চলবে না।'

'মানে?' সুমিত অবাক হয়ে তাকালো।

'আপনি তো রেণুর বন্ধু। বয়েসে যদিও আপনি আমার অনেক ছোট, তবু, তবু আমি আপনাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাই। আপনার আপত্তি আছে?'

'কেন?'

'সব কেনর কি জবাব দেওয়া যায় মশাই। আমার ইচ্ছে আপনি আমাদের বন্ধু হোন।, রেণুকে যদি আপনি ভালবাসেন তাহলে ও যাতে সুখী হয় তাই নিশ্চয়ই চাইবেন? আমি চাই আপনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসুন। বন্ধুর মতো। রেণু খুশী হবে, আমি ওকে খুশী দেখতে চাই।'

কি একটা বলতে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো সুমিত। ওর বুকের ভিতর থর থর করে কাঁপছিলো। এই লোকটা, হাসি হাসি মুখে কথাগুলো বলছে। কিন্তু তা কি খুব স্বাভাবিক শোনাচ্ছে? এর চাইতে যদি সরাসরি ঝগড়া হতো তাহলে ও বেঁচে যেতো। একটা নতুন ফাঁদে ওকে ফেলার আয়োজন তৈরী হয়ে গেছে।

'কি ভাবছেন এতো! সন্ধি করতে হলে তো অনেক কিছু ছাড়তে

হয় মশাই। আসুন, হাত বাড়ান।' হাসতে হাসতে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো বরেন।

সুমিত পাথরের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। রেণুর তাকালো এবার। উড়ে আসা ছাই পায়ে করে চেপে ধরেছে রে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে সেটা। সুমিত দেখলো, রেণু কাঁদছে। তার সেই কান্নামাখা মুখ তুলে অদ্ভুত প্রত্যাশা নিয়ে সুমিতের চে ওপর চোখ রাখলো ও।

মুখ ফেরালো সুমিত। ও দেখলো, একটা লোমশ বয়স্ক হা তার পাঁচটা আঙ্গুল প্রসারিত করে ওর দিকে এগিয়ে এসেছে। সঙ্গে ওর মনে পড়লো ওর নিজের ডান হাতের মুঠোয় সে আধপোড়া টুকরোটা এখনো ধরা রয়েছে। অস্পষ্ট, তবু যেটায় প গিয়েছিলো—এই আমি রেণু।

এখন ও কি করবে? অসহায় চোখে ও আবার রেণুর দি তাকালো। আর এইসময় হঠাৎ ওর মনে হলো, রেণুর এই মুখ, এ চোখ, এই ভঙ্গী—এর আগে কখনো দ্যাখেনি ও।

ডান হাতের মুঠো আলগা করলো সুমিত। পোড়া ছাই চেহা পাল্টে হাত কালো করে দিয়েছে।

ঈশ্বর! এই চোখে এত জল থাকে কেন?